অপরাহ্ন

হুমায়ূন আহমেদ

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

১. ভোররাতে মনিরউদ্দিন স্বপ্ন দেখে জেগে উঠল....3
২. পরবর্তী কয়েক মিনিটের মধ্যে....6
৩. শরিফা হাঁপাচ্ছিল....14
৪. মাইয়ামাইনষের উপরে গোস্বা....21
৫. নিবারণ ওঝার বয়স....37
৬. ময়মনসিংহ থেকে উত্তরের দিকে....47
৭. খবির হোসেন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে....57
৮. সুরা এখলাস পড়ে বুকে ফুঁ....66
৯. মনিরউদ্দিনের বাড়ির ভিড়....72
১০. এতগুলি মানুষ মাঠে কাজ করছে....82
১১. মতির মা খাবার নিয়ে এসেছে....92
১২. মাগরেবের নামাজের আজান....106
১৩. কাঁদছিল অন্তু মিয়া....108

১৪. গরুর গাড়ি হেলেদুলে চলছে..110

১. ভোররাতে মনিরউদ্দিন স্বপ্ন দেখে জেগে উঠল

ভোররাতে মনিরউদ্দিন স্বপ্ন দেখে জেগে উঠল।

স্বপ্নটা তার মনে ছিল না, কিন্তু তার মায়া মনিরউদ্দিনকে আচ্ছন্ন করে রাখল। স্বপ্নের মধ্যে খুব আনন্দের কিছু ছিল। তেমন আনন্দময় জীবন তার নয়। আর নয় বলেই হয়তো ভোররাতের স্বপ্ন তাকে অভিভূত করে রাখল। সে উঠে বসল। খুব সাবধানে পাশে শুয়ে-থাকা শরিফার গায়ে হাত রাখল। শরিফা ঘুমের ঘোরে চমকে একটু সরে গিয়ে কিশোরীদের রিনরিনে গলায় বলল–না, না।

মনিরউদ্দিন হাত সরিয়ে নিল। অন্য সময় এরকম হয় না। গায়ে হাত রাখলেই কাছে টানতে ইচ্ছে করে। আজ করছে না। কেন করছে না?

বৈশাখ মাসের অসহ্য গরম। এক ফোঁটা বাতাস নেই। ঝিম ধরে আছে চারদিক। ঘরের ভেতর ঘামের গন্ধের মতো কটু গন্ধ। ভোররাতের স্বপ্নের সঙ্গে এর কোনটিরই মিল নেই। মনিরউদ্দিন চৌকি থেকে নামতে গেল। অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ে না। কোথায় যেন একটি চিমটি রাখা, পা লেগে সেটি গড়িয়ে চলতে লাগল। চৌকির নিচের হাঁস-মুরগিগুলি এই অস্বাভাবিক দৃশ্যে ভয় পেয়ে কককক করতে লাগল। মনিরউদ্দিন বিরক্ত মুখে বলল-আহ্, চুপ। কিন্তু তারা চুপ করল না। একটি সাদা মোরগ চৌকির নিচ থেকে বেরিয়ে এসে প্রবল বেগে ডানা ঝাপ্টাতে লাগল। শরিফা জেগে উঠে ভয়-পাওয়া গলায় বলল, কি হইছে?

মনিরউদ্দিন ভারি গলায় বলল, কিছু হয় নাই।

কই যান?

যাই না।

মনিরউদ্দিন দরজা খুলে উঠোনে এসে দাঁড়াল। মুরগিগুলি এখনো কককক করছে। দরজা খোলা দেখে হয়তো জানতে চাচ্ছে ভোর হয়েছে কি না। শরিফা জিভ দিয়ে তালুতে অদ্ভূত একটা শব্দ করতেই ওরা থেমে গেল। যেন এতক্ষণ এই পরিচিত শব্দটি শোনবার জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

শরিফা আবার শুয়ে পড়ল। এই অসহ্য গরমেও তার গায়ে একটি পাতলা কাঁথা। খোলা দরজায় খানিকটা চাঁদের আলো এসেছে। সেই আশোয় শরিফার মুখ অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। সতের বছরের একটি তরুণীর রোগশীর্ণ কোমল মুখ। এই নিগ্ধ কোমল মুখের সঙ্গে মনিরউদ্দিনের স্বপ্নের মিল ছিল, কিন্তু সেই মিল তার চোখে পড়ে নি। সে ঘর ছেড়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

মুরগিগুলি আবার কককক করছে। শরিফা ঘুমের ঘোরেই সেই অদ্ভুত শব্দ করল। ওরা আবার শান্ত হয়ে গেল। বহু দূর থেকে ঝিকঝিক শব্দ আসছে। ট্রেনের শব্দ। দিনমানে কখনো শোনা যায় না। ট্রেনের শব্দে মনিরউদ্দিনের ভেতর এক ধরনের চাঞ্চল্য লক্ষ করা গেল। সে উঠোন ছেড়ে বাঁ দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যেন সে ট্রেনের শব্দ আরো ভালো করে শুনতে চায়। বাঁ দিকে দুটি অফলা লেবুর প্রকাণ্ড ঝাড়। আকাশে চাঁদ থাকা সত্ত্বেও এ-জায়গাটায় অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। মনিরউদ্দিন স্বপ্নের কথা ভেবেই হয়তো শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল। আর ঠিক তখন সে পায়ে তীব্র ও তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল। পৃথিবী দুলে ওঠার মতো ব্যথা। মনিরউদ্দিন অসম্ভব অবাক হয়ে লক্ষ করল, লম্বা কালে সাপটি

এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিছুদূর গিয়েই সে আর নড়ল না। মাথা ঘুরিয়ে মানুষটিকে দেখতে লাগল, যেন সে তার কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত।

মনিরউদ্দিন ভাঙা গলায় বলল, হারামজাদী, তুই করছস কী।

সাপটিকে স্ত্রীজাতীয় মনে করার তার কোন কারণ ছিল না। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় পুরুষ এবং স্ত্রী-সাপের ভেতর কোনো রকম পার্থক্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু মরিউদ্দিনের ধারণা, হৃদয়হীন ব্যাপারগুলি স্ত্রীজাতীয় প্রাণীদের দ্বারাই হয়ে থাকে। এরা এসব করে না-বুঝে। কাজেই তাদের ওপর রাগ করা যায় না। সে সাপটির ওপর রাগ করল না। ক্লান্ত গলায় বলল, হারামজাদী, ভাগ! যা করনের করছ, দেখস কী? দেখনের কিছু নাই। সাপটি মনে হয় তার কথা শুনল। ঢুকে গেল লেবুঝোপের ভেতর। সবুজ লুঙ্গি-পরা খালিগায়ের একটি বেঁটেখাটো লোকের পায়ে সে তার তীব্র বিষের অনেকখানি ঢেলে দিয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে কি ভাবছে? জানার কোনো উপায় নেই। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের চিন্তাচেতনা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।

চাঁদের আলো একটু যেন স্পষ্ট হল। হয়তো মেঘে ঢাকা পড়েছিল, মেঘ কেটে গেছে। বাতাসে লেবুফুলের গন্ধ। লেবুগাছগুলি ফল ধরাতে পারে না বলেই প্রচুর ফুল ফোটায়।

২. পরবর্তী কয়েক মিনিটের মধ্যে

পরবর্তী কয়েক মিনিটের মধ্যে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় মনিরউদ্দিন কিছু কাজকর্ম করল। ঘরে ঢুকে কুপি ধরাল। পাটের কোটা দিয়ে এক হাতে দড়ি পাকিয়ে দুটি বাঁধ দিল। একটি হাঁটুর নিচে, অন্যটি উরুতে। তার ভাবভঙ্গিতে কোনো রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না। বরঞ্চ মনে হল, সাপের কামড় খেয়ে তার অভ্যাস আছে।

সে কুপিটিকে ডান পাশে রেখে পা দুটি ছড়িয়ে বসে আছে। তার কপালে ও নাকে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। মনিরউদ্দিন একটা বিড়ি ধরাল। ঘুমের ঘরে শরিফা বিড়বিড় করে কী বলতেই সাদা মুরগিটি গর্বিত ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল। এর অসম্ভব সাহস! সে কুপির পাশে রাখা দেয়াশলাইটিতে একটি ঠোকর দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল। পরক্ষণেই পুতির মতো লাল চোখে গভীর আগ্রহে মনিরউদ্দিনকে দেখতে লাগল। মনিরউদ্দিন ভারি গলায় বলল, কি দেখস?

সাদা মুরগি সেই প্রশ্নের জবাব দিল না। মনিরউদ্দিন হালকা গলায় বলল, দেখনের আর কিছু নাই। খেইল খতম।

পায়ের বাঁধন অতিরিক্ত আঁট হয়েছে। রক্ত চলাচল বন্ধ বলেই তীব্র ব্যথা তাকে কাবু করে ফেলতে লাগল। গোড়ালির কাছে একটি দাঁতের দাগ স্পষ্ট। মুরগির লাল চোখের মতোই সেখানে এক ফোঁটা রক্ত। এতক্ষণে তা কালো হয়ে যাবার কথা, তা হয় নি। কুপির আলোয় উজ্জ্বল লাল রক্তবিন্দু চকচক করছে। মনিরউদ্দিন উঁচু গলায় ডাকল, শরিফা, ওই শরিফা।

শরিফা সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়ল।

একটা ধার কিছু দে। রক্ত বাইর করন দরকার।

কি হইছে?

পাওডার মইধ্যে বন্ধন দেখস না? দুই বান দিছি।

আপনের কী হইছে?

আরে, বেকুব মাইয়ামানুষ লইয়া মুসিবত। সাপে কাটছে বুঝস না?

শরিফা চৌকি থেকে তাড়াহুড়া করে নামতে গিয়ে মেড়ি খেয়ে পড়ল। মনিরউদ্দিন বিরক্ত স্বরে বলল, ইস-জ্ঞান নাই? ব্লাউজের বোতাম ঠিক করু। হায়াশরম নাই?

ব্লাউজের বোতাম নেই। সেফটিপিন ছিল, কোথায় খুলে পড়ে গেছে। শরিফা ব্যাকুল চোখে সেফটিপিন খোঁজে, সেই সঙ্গে আকাশ-ফাটানো চিৎকার দিতে যায়, কিন্তু চিৎকার দেয় না। মনিরউদ্দিন রাগী চোখে তাকিয়ে আছে। চিৎকার দিলেই ক্ষেপে যাবে। শরিফা ফিসফিস করে বলল, কোনখানে কাটছে?

হেইটা দিয়া তুই কবি কি? যেইখানেই কাটুক-এক কথা। তুই যাস কই?

মানুষজনরে খবর দেই।

চুপ কইরা বইসা থাক্। সকাল হউক, ব্যবস্থা হইব।

দেরি হইব।

হইলে হইব। তুই চুপ থাক্। মাইয়ামানুষ কথা বেশি কইলে সংসারে আল্লাহ্‌র গজব পড়ে। পানি গরম দে। চুলা জ্বালা।

গরম পানি দিয়া কী হইব?

আহ্, খালি কথা বাড়ায়। আরে, তুই যাস কই?

শরিফা কখনই এই মানুষটির কথার অবাধ্য হয় নি। কিন্তু আজ প্রথম সে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ফেলা দরজা দিয়ে উঠোনে নেমে ছোট-ঘোট পা ফেলে ছুটতে শুরু করল। এদের বাড়িটি গ্রামের এক প্রান্তে। মেয়েটিকে অনেকখানি পথ যেতে হবে।

ভোররাতের নির্জন গ্রাম। মরা চাঁদের অস্পষ্ট আলো। এর ভেতর দিয়ে এলোচুলে একটি রূপবতী তরুণী দৌড়াচ্ছে। মাঝে-মাঝে তার অস্পষ্ট কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। দৃশ্যটি ছবির মধ্যে সুন্দর।

মৌলানা খবির হোসেন ফজরের নামাজের জন্যে অজু করতে বের হয়েছিলেন। তিনি অবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখলেন। কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই মেয়েটি অনেক দূর চলে গেল। তাকে এখনো ডাকা যায়। কিন্তু তা ঠিক হবে না। তিনি একা মানুষ। রাতের বেলা মেয়েছেলে ডাকাডাকি করার অনেক রকম অর্থ করবে লোকে। মানুষের মনভর্তি পাপ। তিনি একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, অজুর দোয়ায় গণ্ডগোল করে

ফেললেন। তের বছর বয়স থেকে এই দোয়া তিনি দিনে পাঁচ বার করে পড়েন, আজ তাঁর বয়স সাতচল্লিশ। এত দিন ধরে পড়া একটি ছোট্ট দোয়ায় ভুল হবে কেন?

খবির হোসেন চিন্তিত মুখে মসজিদের দিকে রওনা হলেন। মসজিদের আশেপাশে একটাও মানুষ নেই। ধর্মকর্মে মন নেই মানুষের ধর্ম ছাড়া মানুষ আর হয়ওয়ানএই দুয়ের মধ্যে তফাত কিছু নেই। কিন্তু এই জিনিস বুঝবে কে? একটা ভালো কথা বললে কেউ বুঝতে পারে নাই তোলে। বেকুবের দল! গত জুম্মার দিনে খাবার পর তিনি ইবলিশ শয়তানের কথা শুরু করেছেন, তখন এক জন বলে বল, তাড়াতাড়ি করেন ইমাম সাব। কী সর্বনাশের কথা! হাদিস-কোরানের কথা শুনতে চায় না। এইসব কেয়ামতের নিশানা। কেয়ামত যখন নজদিক, তখন খোদার কথা কেউ শুনতে চায় না। দুনিয়াদারি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ইমাম সাহেব মসজিদের তালা খুললেন। এই তালা গত হাটবারে কেনা হয়েছে। খোদার ঘরে তালা দিয়ে রাখতে হয়, এর চেয়ে লজ্জার কথা কিছু আছে? কত বড় সাহস মানুষের খোদার ঘর থেকে চাটাই এবং অজুর বদনা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। আফসোসের কথা! রোজ হাশরের দিনে আল্লাহপাক যখন জিজ্ঞেস করবেন—পেয়ারা বান্দা, তুমি যে আমার ঘর থেকে বদনা নিয়ে গেলে, বিষয়টা কী বল দেখি? তখন কী জবাব দেবে? ভাবতে গিয়েও খবির হসেনের গা ঘেমে যায়। সূর্য থাকবে এক হাত মাথার উপরে। মাবুদে এলাহি। কী ভয়ংকর দিন আছে আমাদের সামনে! কী ভয়ংকর দিন।

তিনি আজান দেবার জোগাড় করলেন। ফজর ওয়াক্ত হয়েছে কি না ঠিক বোঝ যাচ্ছে না। আকাশে চাঁদ থাকলে এই মুশকিল। সময় আন্দাজ করা যায় না। অথচ একটা ঘড়ির কত আর দাম? এতগুলি মানুষ চাঁদা তুলেও তো একটা ঘড়ি কিনতে পারে। যদি কিত, কত

বড় এক জন সাক্ষী হত তাদের। হাশরের ময়দানে এই ঘড়ি কথা বলত। ঘড়ি বলত, হে বুদ, তোমার বান্দাদের হয়ে আমি সাক্ষ্য দিতেছি। হে মাবুদ, তোমার এইসব পেয়ারা বান্দারা আমাকে খরিদ করেছিল......

স্লামালিকুম ইমাম সাব।

ওয়ালাইকুম সালাম।

বদর মুনশি এসে পড়েছে। তার মানে ফজর ওয়াক্তের আর দেরি নেই।

আজান হইছে ইমাম সাব?

না, এখনো হয় নাই। সময় এখনো কিছু আছে।

বদর মুনশি অজু করতে গেল। টিনের একটা ড্রামে অজুর পানি তোলা আছে। তোলা পানিতে অজু করা ঠিক নয়। অল্পতেই তোলা পানি নাপাক হয়। সবচেয়ে ভালো পুকুরের পানি। পানি নষ্ট হবার ভয় নেই। একটা পুকুর কাটা এমন কোন সমস্যা না। কিন্তু কাটবেটা কে?

বদর মুনশি।

জ্বি।

একটা মেয়েছেলেরে দৌড়াইয়া যাইতে দেখলাম। বেপর্দা অবস্থায় দৌড়াদৌড়ি.....

আমি দেখছি, মনিরের বৌ।

বিষয় কি?

জানি না। জিজ্ঞেস করি নাই। উত্তরের দিকে যাইতাছে।

অসুখবিসুখ নাকি?

কে কইব?

খবির হোসেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। পাড়াপড়শীর ব্যাপারে আগ্রহ নেই। মেন খারাপ কথা! হয়তো বিপদ-আপদ কিছু হয়েছে। বিপদ-আপদ ছাড়া মেয়েমানুষ দৌড়াবে কেন?

খবর নেওয়া দরকার, হাদিস শরিফে পরিষ্কার লেখা আছে, পড়শীকে নিজের ভাইয়ের মতো দেখিবে। পড়শীর বিপদ নিজের বিপদ বলিয়া জানিবেসহি হাদিস।

এই শেষ না। বোখারী শরিফে আছে, যে-ব্যক্তি প্রতিবেশীর বিপদ দেখে না, আগুন তাহার ভাই।

বলেই খবির হোসেনের মনটা একটু খারাপ হল। তিনি মাঝেমাঝে বানিয়ে বানিয়ে হাদিসের কথা বলে ফেলেন। জিনিসটা উচিত না। আল্লাহপাক নিশ্চয়ই নারাজ হন। কিন্তু তিনি কাজটা মানুষের ভালোর জন্যেই করেন। আল্লাহপাক হচ্ছেন আলেমুল গায়েব, এই জিনিসটিও তিনি নিশ্চয়ই জানবেন।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

খবির হসেন আজান দিয়ে মসজিদের ভেতর এসে বসলেন, যদি আর কেউ আসে। তিনি অনেকক্ষণ বসে রইলেন। কেউ এল না।

বদর মুনশি বিরক্ত হয়ে বলল, নামাজ পড়েন। দেরি করতেছেন কেন?

আজান দিয়া সাথে-সাথে নামাজে দাঁড়া হাওয়া ঠিক না। হাদিসে নিষেধ আছে। দেখি একটু, যদি কেউ আসে।

আকাশ ফর্সা হয়ে এল। কাউকে আসতে দেখা গেল না। খবির হোসেন ভারি মন নিয়ে নামাজের জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। তখন হঠাৎ মনে হল, ঘরে বিপদ-আপদ হলে মেয়েটা কাছের মানুষের কাছে না-এসে এত দূরে যাচ্ছিল কেন? তাঁর কাছে আসতে পারত। এল না কেন? ছিঃ ছিঃ, নামাজের মধ্যে এইসব কি ভাবছেন তিনি। নামাজ কবুল হবে না। আর তাঁরটা কবুল না হলে পাশে যে আছে, তারটাও হবে না। ইমামতি করার মত দায়িত্বের কাজ আর কিছু আছে? বিরাট একটা দায়িত্বের কাজ। এই কাজটা ঠিকমতো করতে পারছেন না। বড় লজ্জার কথা।

কিন্তু মেয়েটা তাঁর কাছে এল না কেন? মনিরের বৌ তো তাঁকে চেনে। আর না চিনলেই কী? বিপদের দিনে পর্দা থাকে না, রোজ হাশরের দিনে ছেলেমেয়ে একসাথে দাঁড়াবে। বেপর্দা অবস্থায় দাঁড়াবে। কারো গায়ে কোনো কাপড় থাকবে না। এর মানে কী? মানে অতি পরিষ্কার। বিপদের দিনে কোন পর্দা নাই। পর্দা মাফ।

পেছনের সারি থেকে খুক করে দবির কেশে উঠল। নকল কাশি। তার মানে ইমাম সাহেব দীর্ঘ সময় ধরে রুকুতে আছেন। খবির হোসেনের অনুতাপের সীমা রইল না। আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়া হয়ে এসব কী। আল্লাহ্ কি তাঁকে হাশরের ময়দানে জিজ্ঞেস করবেন না— হে বান্দা, তুমি নামাজে দাঁড়া হয়ে দুনিয়াদারির কথা ভাব। তখন মানকের, নেকের বলবেইহা সত্য। ইহা সত্য। হায় হায়, কী লজ্জার কথা!

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

৩. শরিফা হাঁপাচ্ছিল

শরিফা হাঁপাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এক্ষুণি দম বন্ধ হয়ে যাবে। তার কেবলি মনে হচ্ছে ঘরে ফিরে দেখবে মানুষটা লম্বা হয়ে পড়ে আছে। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। লোকজন জেগে উঠবে। নানান কথা জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু কাউকে কিছু বলা যাবে না। সাপে কাটার ব্যাপারটা জানাজানি হওয়া খুব খারাপ। যতই জানাজানি হবে ততই বিষ উঠবে। ওঝা এসে ঝাড়ফুক করবার পর তোকজন জানুক, তাতে ক্ষতি নেই। শরিফা জলিলের ঘরের দাওয়ায় উঠে এল। জলিল ঘুমুচ্ছিল। ডাকাডাকিতে উঠে এল। অবাক হয়ে বলল, বিষয় কি?

আপনের দোস্তরে সাপে কাটছে।

কও কী? কোন সময়?

শেষ রাইতে।

কী সর্বনাশের কথা। এতক্ষণ করছ কী?

আমারে কিছু কয় নাই।

আচ্ছা ঠিক আছে, বাড়িত যাও। আমি ওঝার কাছে যাইতেছি। তুমি মুখ খুলবা না। কেউরে একটা কথা কইবা না।

জলিল জামা গায়ে দিল। তার স্ত্রী পোয়াতি। এখন-তখন অবস্থা। সে বিছানা থেকে ক্ষীণ স্বরে বলল, শরিফা ক্যান আইছিল?

এম্নে আইছে।

কইছে কি?

কিচ্ছু কয় নাই।

ঘরে ঢুকল না ক্যান?

আহ্, চুপ।

জলিল রওনা হল ধূপখালির দিকে। নিবারণ ওঝার খুব নামডাক। এখন তাকে পাওয়া গেলে হয়। সাপে কাটার সময় এখন। হয়তো খবর পেয়ে চলে গেছে কোনখানে।

আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। কাক ডাকছে। তাদের কর্কশ শব্দ আজ যেন অন্য দিনের চেয়েও বেশি। সাঁকো-পারে ভোলা মিয়ার সঙ্গে দেখা। সে বিস্মিত হয়ে বলল, দৌড়াও ক্যান? কি হইছে?

কিছু হয় নাই।

জলিল থামল না, আরো দ্রুত পা ফেলতে লাগল। ভোলা মিয়া দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল না। মনে হল সে বুঝতে পেরেছে। এখন গ্রামে গিয়ে উঁচু গলায় বলাবলি নাকরলেই হয়। যতই জানাজানি হবে বিষ ততই চড়তে থাকবে। নিয়মই এই রকম।

শরিফা ঘরে ফিরে দেখল–মনিরউদ্দিন ঘরের ভেতর থেকে বারান্দায় এসে বসেছে। বিড়ি টানছে নিজের মনে। শরিফা ক্ষীণ স্বরে বলল, জলিল ভাই ওঝা আনতে গেছে।

গেছে ভালো হইছে। পানি জ্বাল দে। চুলা ধরা।

পানি দিয়া কী করবেন?

আহ্, খালি কথা বাড়ায়।

শরিফা বাধ্য মেয়ের মতো চুলা ধরাতে গেল। তার এখন বেশ শান্তি লাগছে। বিষ বেশি দূর উঠতে পারে নি। বিষ উঠে গেলে কথা জড়িয়ে যেত। সে সাপে-কাটা মানুষ মরতে দেখেছে। গলার স্বর আস্তে-আস্তে ভারি হয়ে যায়। চোখের তারা বড় হতে থাকে। এমনভাবে তাকায় যেন কাউকে চিনতে পারছে না, অথচ ঠিকই চিনতে পারে। ঘন-ঘন পানি খেতে চায়, কিন্তু দু-এক ঢোক খেয়েই বলে, তিতা লাগছে। এক সময় অল্প-অল্প বমি করে।

শরিফা অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচিতে এক ডেকচি ফুটন্ত পানি এনে সামনে রাখল। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

সূচিপত্র

একটা বদনার মধ্যে পানিটা নিয়া আস্তে-আস্তে আমার পায়ে ঢাল্।

শরিফা অবাক হয়ে বলল, কোনখানে ঢালমু?

সাপে-কাটা জায়গাটার মইধ্যে ঢাল্।

শরিফা আঁতকে উঠে বলল, এইটা কী কনা বলক-দেওয়া পানি। পাও পুইড়া কয়লা হইয়া যাইব।

তোরে যা কইছি করু। কথা বাড়াইস না।

পাও পুইড়া সিদ্ধ হইয়া যাইব।

হউক। খালি কথা বাড়ায়।

শরিফার হাত কাঁপছে। পানি ফেলতে গিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মনিরউদ্দিন স্থির হয়ে বসে আছে। একবার সে শুধু জন্তুর মতো চিৎকার করেই চুপ করে গেল। শরিফা নিজেই কেঁদে ফেলল। এই কষ্ট কেউ ইচ্ছা করে সহ্য করতে পারে। খোদার আলমে এমন মানুষ আছে?

তুই কান্দস ক্যান? তোর তো কিছু হয় নাই।

শরিফা গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল। মনিরউদ্দিন তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাকিয়ে আছে নিজের পায়ের দিকে। শরিফা পানি এক জায়গায় ফেলতে পারে নি। চারদিকে ছড়িয়েছে।

ফোস্কা পড়ে গেছে সেসব জায়গায়। অসহ্য যন্ত্রণা! কিন্তু এই যন্ত্রণার ভেতরও একটি ক্ষীণ আশার ব্যাপার আছে। সাপের কামড়ের জায়গাটি থেকে ক্ষীণ একটি রক্তের ধারা নেমে যাচ্ছে। জমাট বিষ বেরিয়ে যাচ্ছে। মনিরউদ্দিন ক্লান্ত গলায়। বলল, একটা পাখা আন্। হাওয়া করু।

প্রয়োজনের সময় কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। তালের পাখা বিছানায় নিয়ে শুয়েছিল, সেটি এখন কোথাও নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার। এটা যাবে কোথায়?

শরিফা।

কি?

করতাছস কি?

পাখা খুঁজি।

বাদ দে।

শরিফা দরজা ধরে অপরাধীর ভঙ্গিতে দাঁড়াল। তার গালে পানির দাগ এখনো শুকায় নি।

রোদ উঠে গেছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু এই বাড়িতেই সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল।

মনিরউদ্দিন হঠাৎ করেই অসম্ভব নরম গলায় বলল, আমার এক মামি আছিল-চাঁনসোনা নাম। তোর মতো সুন্দর আছিল। বাঞ্জা মাইয়ামানুষ। পুলাপান ছিল না।

শরিফা ভেবে পেল না, হঠাৎ মামির কথা আসছে কেন।

শরিফা।

কি?

মামিটা বড় ভালো আছিল। মজার শিলুক দিত।

হঠাৎ তার কথা কন ক্যান?

কোনো কারণ নাই। এমনে মনে হইল। এক গেলাস পানি দে। তিয়াষ হইতাছে।

শরিফা পানি এনে দিল। মনিরউদ্দিন পানি খেতে পারল না। এক ঢোক খেয়েই বলল, পানি তিতা লাগছে।

রক্তশূন্য হয়ে গেল শরিফার মুখ। কী সর্বনাশের কথা! পানি তিতা লাগবে কেন?

মনিরউদ্দিনের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। দড়ি দিয়ে বাঁধা পা অনেকখানি ফুলে উঠেছে। সে থেমে-থেমে শ্বাস নিচ্ছে, যেন শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

বড় আদর করত আমারে।

কার কথা কন?

আমার মামি। চাঁনসোনা নাম। আমার জীবনা কষ্টে গেছে, বুঝছস শরিফা। খুব কষ্টে।

শরিফা তাকিয়ে আছে। তার চোখ দুটি বড়-বড়। সেখানে পানি টলটল করছে। সাদা মোরগটি এগিয়ে আসছে। এর কৌতূহল অন্যদের চেয়ে বেশি।

শরিফা। আমার মামি বড় সুন্দর-সুন্দর কথা কই।

জ্বি।

মনিরউদ্দিনের কথা। জড়িয়ে যাচ্ছে। বিশাল একজন মানুষ কেমন শিশুদের ভঙ্গিতে কথা বলছে।

৪. মাইয়ামাইনষের উপরে গোস্বা

মামি সবসময় বলত–মাইয়ামাইনষের উপরে গোস্বা করবি না। এরা উলটাপালটা কাম করে। বুদ্ধি-কম জাত, কি করবি?

মনিরউদ্দিন মামি যা বলত তাতেই মাথা নাড়ত। কারণ তার তখন চরম দুঃসময়। মনে ভয় ঢুকে গেছে। মনে হচ্ছে মামিও তাকে দূর করে দেবে। একদিন কাছে ডেকে এনে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে নরম গলায় বলবে, আকালের দিন পড়ছে রে বাপ! একটা বাড়তি পেটের জায়গা নাই। তুই অন্য জায়গা দেখ।

এই বলে সে খানিকক্ষণ কাঁদবে খুনখুন করে, তারপর একটা চকচকে সিকি হাতে ধরিয়ে দেবে। সাত বছর বয়সের মনির মিয়াকে তার ইহজাগতিক সম্বল একটি লুঙ্গি এবং একটি গামছা কাঁধে নিয়ে নতুন আশ্রয় খুজতে হবে। কোথায় খুঁজবে সে? খোঁজা হয়ে গেছে। কোথাও আর কেউ নেই।

কিন্তু মামি চরম আকালের দিনেও তাকে বের করে দেয় নি। উঠতে-বসতে এক শ কথা শোনায় নি। বরং আড়ালে-আবডালে ডেকে নিয়ে বলেছে, মাটি কামড় দিয়া পইড়া থাক। তোর মামা মাইরধর করব, খেদাইয়া দিতে চাইব। পুলাপান মানুষ তুই, যাইবি কই? খাইবি কী? আমি যত দিন আছি, তুইও থাকবি।

কী ভয়াবহ দুর্দিন। বৈশাখের ফসল মারা গিয়েছে। নাবাল অঞ্চলের ফসল এই একটিই। মানুষ খাবে কী?মনিরউদ্দিনের মামা চোখ লাল করে সারা দিন উঠোনে বসে থাকে। তার দিকে তাকালেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় মনিরউদ্দিনের। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, মামা

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

তাকে কিছু বলে না। সংসারের তিনটিমাত্র পেট পালতে গিয়ে লোকটি দিশাহারা হয়ে যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড গরমে খা-খ করে গ্রাম। মনিরউদ্দিন দুপুরে একা-একা ঘুরে বেড়ায়। বাড়ি ফিরলেই আমি ফিসফিস করে বলে, অত হাঁটাহাঁটি করিস না। হাঁটাহাঁটি করলেই খিদা লাগব। খিদা লাগলে খাবি কী? পাতিল ঠনঠন।

সেই এক বৎসরেই মামা পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে গেল। অসুখবিসুখে শরীরও নষ্ট। মুনিষের কাজ, ঘরামির কাজ কিছুই করার ক্ষমতা নেই। কাঁঠালগাছের নিচে একটা চাটাই পেতে সারা দিন শুয়ে থাকে। বিড়বিড় করে সারা দিন কথা বলে কাঁঠালগাছের সঙ্গে। মজার-মজার কথা। হাত নাড়িয়ে-নাড়িয়ে বলে আর হাসে। মাঝেমাঝে চুপ করে থাকে, তখন তার ভঙ্গি দেখে মনে হয় সে কথা শুনছে। লোকজন অবাক হয়ে দেখতে আসে। সে নির্বিকার। মনিরউদ্দিনও দেখে চোখ বড়-বড় করে, কাছে যেতে সাহস পায় না।

মামি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, মানুষটার মাথা-খারাপ হইছে বুঝছস মনির মিয়া? গাছের সাথে দোস্তি। রাইজ্যের আলাপ করে গাছের সাথে। কী সব্বনাশের কথা ক দেখি।

এই বলেই সে হাসে খিলখিল করে। মনিরউদ্দিন বুঝতে পারে না, তার হাসা। উচিত কি না।

ও মনির মিয়া, লোকটা পাগল হইলেও কিন্তু খারাপ না কি কস? এই যে অত দিন থাকলি—একটা কথা হইছে? অন্য কেউ হইলে লাথ দিয়া বাইর কইরা দিত। দিত কি না?

দিত।

পেটের খির মতো খারাপ জিনিস নাই। বাঘেরা পেটে যখন খিদা ওঠে, তখন কী করে জানস?

না।

নিজের বাচ্ছা খায়। বিলাইও নিজের বাচ্ছা খায়। নিজের চউক্ষে দেখা। আল্লাহর কিরা।

মামার চিকিৎসা কিছু হল। গ্রাম্য চিকিৎসা। মাথা কামিয়ে খালিশপুরের পীর সাহেবের তেল-পড়া। তাতে লাভ হল না। শুধু মামার মুখটা শিশুদের মুখের মত হয়ে গেল। লোকটা মারা গেল ভাদ্র মাসে। যথারীতি গাছের নিচে শুয়ে ছিল। সন্ধ্যাবেলা রুটি আর ডাল নিয়ে খাওয়াতে গিয়ে দেখা গেল শক্ত হয়ে পড়ে আছে। মুখ হাঁ-করা। অসংখ্য লাল পিপড়া সারিবদ্ধভাবে মুখের ভেতর ঢুকছে এবং বের হয়ে আসছে।

মনিরউদ্দিনের মামি মৃত্যুকে গ্রহণ করল খুব স্বাভাবিকভাবে। তাকে দেখে মনে হল না, সে খুব-একটা মন-খারাপ করেছে। কান্নাকাটি হৈচৈ কিছুই নেই। দুঃসময়ে এক জন মানুষ কমে গেল, এই নিয়ে সম্ভবত কিছুটা খুশি। মনিরউদ্দিনকে দিয়ে গ্রামের মাতবরদের বলে পাঠাল, লেকটার কবর যেন কাঁঠালগাছটার নিচে দেওয়া হয়।

মাতবরদের একজন বজলু সরকার। লোকটি যে-কোনো কথাতেই রেগে ওঠেন। তিনি যথারীতি রেগে গিয়ে বললেন, কেন, কাঁঠালগাছের নিচে কেন?

গাছটার সাথে শেষ সময় মানুষটার দোস্তি হইছিল। নানান কথা কইত।

বজলু সরকার আকাশ থেকে পড়ল। বলে কী এইসব। সে বিস্ময় গোপন করে বলল, কী বলো তুমি? কার সাথে দোস্তি?

গাছের সাথে।

পাগল-ছাগলের মতো কথা কইবা না। আর শোন, স্বামী মারা গেল, চউক্ষে এক ফোঁটা পানি নাই—কেমন মেয়েমানুষ তুমি?

চউক্ষে পানি না-আইলে কি করমু কন?

আরে, এইটা তো মহা বেয়াদপ, মুখে-মুখে কথা কয়! এইসব কিয়ামতের নিশানা।

সত্যি-সত্যি কিয়ামতের নিশানা। পরের বৈশাখেও ফসল মারা পড়ল। পাকা ধানের খেত তিন ঘন্টার বৃষ্টিতে পানির নিচে গেল। বানিয়াবাড়ি গ্রামের মানুষগুলি পাথর হয়ে গেল। এটা কেমন কথা! আল্লাহ্‌র কেমন বিচার?

মৌলানা খবির হোসেন নানান জায়গায় বলে বেড়াতে লাগলেন, তিনি জানতেন এমন হবে। ধর্মের পথে কেউ নাই। জুম্মার দিনে নামাজঘরে দশটা লোক হয় না। তিনি অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন। এরকম নাকি কখনো দেখেন নি।

খবির হোসেনের এ-ধরনের কথা বলার অধিকার আছে। তিনি বিদেশি লোক। বহু দেশ-গ্রাম ঘুরে এখানে এসে স্থায়ী হয়েছেন। প্রথম যখন এলেন, তখন বানিয়াবাড়ির খুব রমরমা। মাঠভর্তি পাকা ধান। বৃষ্টি-বাদলায় একটি ধানের শিষও নষ্ট হয় নি। ধান কাটা

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

হচ্ছে। রাত জেগে মেয়েরা সেই ধান সেদ্ধ করছে। হৈচৈ, চিৎকার। খবির হোসেনের বিস্ময়ের সীমা রইল না। এত ফসল ফলে ভাটি অঞ্চলে। এ দেখি আল্লাহতালার নিয়ামতের জায়গা!

তাঁর বিস্ময় দেখে বানিয়াবাড়ির লোকজন মহাখুশি। তারা দাঁত বের করে হাসে। একটা ফসল তুলি, বুঝলেন মৌলানা সাব, তারপরে পায়ের উপরে পা তুইল্যা সারা বচ্ছর খাই। ভাতের অভাব নাই।

তাই তো দেখতেছি।

এইটা হইল মৌলানা সাব ফুর্তির জায়গা। আমরা নিজেরার গানের দল আছে। বাইদ্যবাজনা হয়।

এইসব তো ঠিক না। গান-বাজনা হাদিস-কোরানে নিষেধ আছে।

চেংড়া-ফেডোরা করে আর কি। কাজকর্ম তো কিছু নাই—কি করবেন কন?

গ্রামের মুরুব্বিরা বললেন, থাইকা যান মৌলানা সাব। গেরামে মসজিদ আছে। আজান দিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন। হাদিস-কোরানের কথা কইবেন। খাওয়াখাইদ্যের কোনো চিন্তা নাই। খোরাকি বাদ দিয়াও বছরে চল্লিশ-পঞ্চাশ মণ ধান পাইবেন। বিয়া-শাদি, পালা-পার্বণে মসজিদের ইমাম সাবের জন্যে আলাদা বন্দোবস্ত আছে। বানিয়াবাড়ি জায়গা খারাপ না।

খবির হোসেন থেকে গেলেন। এরা ভুল বলে নি। জায়গা ভালোই। রাতদিন মাঠের উপর দিয়ে হু-হু করে হাওয়া বয়। মন আনচান করে। বর্ষাকালে পানিতে ঢেকে যায় চারদিক। তখন ভাটি অঞ্চলের অন্য রূপ। বিয়ে-শাদি শুরু হয়। গানের দল দিনরাত ঢোল বাজিয়ে গান করে। মহা উৎসাহে বুড়োর দল ঘন্টার পর ঘন্টা খেলে বাঘবন্দি। কাজকর্মের কোনোবালাই নেই। বর্ষার সময়ে কাজ একটাই-খাওয়া এবং ঘুম। বড় বিচিত্র জায়গা। খবির হোসেনের বড় পছন্দ হল ব্যাপারটা। একটা বিয়ে-শাদি করে সংসারধর্ম শুরু করার ইচ্ছাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। জমি সস্তা। কিছু জমিজমা করা খুব কঠিন হবে না। ভাটি অঞ্চলের সস্তার ধান কিনে উজান দেশে বিক্রি করলেও ভালো পয়সা। সেটাও করা যায়, এতে দোষের কিছু নেই। স্বয়ং রসুলুল্লাহ ব্যবসাবাণিজ্য করতেন। রুজির বার আনা হল গিয়ে ব্যবসায়। হাদিসের কথা। রসূলুল্লাহ্ নিজে তাঁর সাহাবিদের বলে গেছেন।

টাকাপয়সা হওয়া দোষের না। টাকাপয়সা থাকলে মনে শান্তি থাকে। আল্লাহখোদর নাম নেওয়া যায়। পেটে ক্ষুধা থাকলে মনে ঢোকে শুধু ভাতের চিন্তা। বড় চিন্তা আসে না।

এই যেমন এখনকার অবস্থা—বড় ভালো আছেন। মনে বড় শান্তি। আল্লাহকে ডাকতে পারছেন। ইবাদত-বন্দেগি করেও আরাম পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু শেষের দু বছরের অবস্থা দেখে খবির হোসেনের মাথা-খারাপ হবার জোগাড়। এ কী সর্বনাশের জায়গা। ইয়া মাবুদে এলাহি, ইয়া গাফুরুর রহিম। সমস্ত ফসল একসঙ্গে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এই ধারণাই তাঁর মাথায় আসে নি। পরবর্তী ফসলের জন্যে এই লোকগুলির আরো একটা বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। এরা এখানেই থাকবে। অন্য কোন কাজকর্মের ধান্ধায় ঘর ছেড়ে বেরুবে না। কারণ, অন্য কাজকর্ম তাদের জানা নেই।

উজানের দেশ থেকে ধুরন্ধর সব লগ্নিকারী টাকা নিয়ে আসবে। লগ্নি করবে পরের বছরের জন্যে। এক মণ ধানের টাকায় চার মণ ধান দিতে হবে। খবির হোসেন গত বৎসর এই জিনিস হতে দেখেছেন। এই বৎসরও দেখবেন। তারপর যদি সামনের বৎসরও ফসল না হয়, তখন?

মৌলানা সাহেব রোজ চিন্তিত মুখে বজলু সরকারের কাছারিঘরে বসে থাকেন। কারণ এই অভাবের দিনে তাঁর খাবার যায় এই বাড়ি থেকে। বজলু মিয়াকে তুষ্ট রাখা দরকার। বজলু মিয়া তুষ্ট হন না। বিরক্ত স্বলে বলেন, রোজ আইসা বইস্যা থাকেন, ক্যান?

কই যামু, কন?

মৌলানা মানুষ, মসজিদে গিয়ে বইস্যা থাকেন। আল্লাহ-খোদারে ডাকেন।

বড় অসুবিধার জায়গা ভাই এইটা। একটা মোটে ফসল। ফসল গেল তো সব। গেল। কী নাশের কথা।

দুনিয়ার সব জায়গা তো এক রকম না।

তা ঠিক, তা ঠিক। আল্লাহপাক বালির দেশও বানাইছে। যেমন ধরেন মরুভূমি।

বজলু সরকার উত্তর দেন না। রাগী চোখে তাকিয়ে থাকেন। মৌলানা সাহেব নিজের মনেই কথা বলেন, আল্লাপাকের খাস রহমতের জায়গা হইল গিয়া মরুভূমি। নূরনবীর জন্মস্থান।

এখন বাড়িত যান মৌলানা সাব।

জ্বি আচ্ছা। আমি একটা কথা কইতে আসছিলাম।

কি কথা?

ভাবছি দেশে চইলা গেলে কেমন হয়?

যাইতে চাইলে যান। আপনেরে কেউ বাইন্ধা রাখছে?

মসজিদে নামাজ হবে না এইটা নিয়ে মনে একটু কষ্ট, নামাজঘরে পাঁচ ওয়াক্ত আজান হওয়া লাগে, না হইলে আল্লাহ্পাক খুবই নাখোশ হন। আল্লাহ্র গজব নামে।

গজবের আর বাকি আছে?

তাও ঠিক। খুবই ন্যায্য কথা।

বাড়িত যান-বাড়িত গিয়া ঘুমান।

খবির হোসেন চিন্তিত মুখে বাড়ি ফেরেন। রাতে তাঁর ঘুম হয় না। কী সর্বনাশের দেশ। এমন দেশে মানুষ থাকে? নাকি এটা তাঁর ভাগ্য? যেখানে যান সেখানকার অবস্থাই বদলে যায়। তিনি কি মানুষের দুঃখ ও দুর্দশা সাথে করে নিয়ে আসেন। এরকম অপয়া লোক কিছু-কিছু আছে। দুর্ভাগ্য তাদের ঘিরে থাকে। শুধু তাদেরই না, যারাই এইসব লোকজনের সংস্পর্শে আসে তাদেরও এই অবস্থা। তিনি নিজের জীবনেই এটা লক্ষ করেছেন। কত জায়গায় গেলেন, সুখে-শান্তিতে জীবন শুরু করলেন। যেই ভাবলেন এইবার স্থায়ী হবেন,

যাযাবর জীবনের ইতি করবেন, নিজের ঘরসংসার, সামান্য কিছু জমিজমা, ধবধবে সাদা রঙের একটা গাই, উঠোনে পুঁইয়ের মাচা, বাড়ির পেছনে লকলকে ডাঁটা খেত, কয়েকটা হাঁস-মুরগি, সন্ধ্যাবেলায় যাদের ঘরে আবার জন্যে তাঁর স্ত্রী লম্বা ঘোমটা টেনে বেরুবে, নিচু গলায় বলবে, তই তই তই ঠিক তখন একটা ঝামেলায় সব ছেড়েছুড়ে চলে আসতে হয়েছে। আল্লাহপাক এত নারাজ কেন তাঁর উপর? তিনি কি আল্লাহপাকের আদেশ মাথা পেতে পালন করেন নি? রসুলে করিমের শিক্ষা অন্যদের বলেন নি? ভুলত্রুটি তিনি যদি কিছু করেই থাকেন, না-বুঝে করেছেন। আল্লাপাক তার জন্যে এমন কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা কেন করবেন? তিনি হচ্ছেন রহমতের সাগর। সেই রহমতের ছিটেফোঁটাও কি তাঁর জীবনে আসবে না? তিনি কি এতই নাদান। রাত জেগে খবির হোসেন তাহাজ্জতের নামাজ পড়েন। বিড়বিড় করে বলেন দয়া কর, দয়া কর। পানা দাও। আমার জন্যে গ্রামের মানুষগুলিকে তুমি কষ্ট দিচ্ছ কেন? এদের মুক্তি দাও।

খবির হোসেনের বারবার মনে হয়, তিনি গ্রাম ছেড়ে গেলেই সবসমস্যার সমাধান হবে। এই বানিয়াবাড়িতে সুখের প্লাবন বইবে। এমন ফসল ফলবে যে কেটে আনতে ইচ্ছা করবে না। চাঁদের ফকফকা আলোয় ছেলেপুলেরা ছোটাছুটি করবে। বৃদ্ধবৃদ্ধারা ভরপেটে ঘুমুতে যাবে।

অভাব চরমে ওঠে ভাদ্র মাসে। হাড়-জিরজিরে শিশুরা অলস ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়ায়। বেশির ভাগ সময়ই তারা ঘাটে বসে থাকে। কিছুদিন আগে বড় নৌকায় করে সাহায্য এসেছিল। আটা, চিড়া এবং অষুধপত্র। তারা বলে গিয়েছিল আবার আসবে। যদি আসে। সাহায্যের লোকজন আসে না, কিন্তু নানান ধরনের মানুষজনের আনাগোনা বেড়ে যায়। এই ধরনের লোকদের অভাবের সময় দেখতে পাওয়া যায়। এদের কথাবার্তা খুব মোলায়েম। গায়ে

হাত দিয়ে কথা বলে। মিনিটে-মিনিটে সিগারেট সাধে। বানিয়াবাড়ির সবাই জানে, এরা হচ্ছে মতলবাজ লোক। বদ মতলব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তবু চুপ করে থাকতে হয়। দুঃসময়ে কথা বলতে ভালো লাগে না।

গ্রামের মাত্ররা যদিও বলে বেড়ায়—কেউ যেন হালের গরু বিক্রি না-করে। গরু চলে গেলে হাল বন্ধ হয়ে যাবে। সব বেচে দিক, কিন্তু গরু যেন থাকে। অনেকেই তাদের কথা শোনে না। নানান কিসিমের নৌকায় ভাটি অঞ্চলের গরু-ছাগল পার হতে থাকে। পশুরা গভীর মমতায় চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে থাকে গ্রামের দিকে। ভাদ্র মাসের ভরা নদী ছল-ছলাৎ করে।

এই রকম চরম দুঃসময়ে মনিরউদ্দিনের মামি চাঁনসোনার ঘরে গ্রামের মাত্ররা একত্র হন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ হচ্ছেন নিয়ামত খাঁ। তিনি ঠাণ্ডা গলায় বলেন, এইসব কি করতাম তুমি চাঁনসোনা? ছিঃ ছিঃ।

চাঁনসোনা উত্তর দেয় না। দরজার ওপাশ থেকে তার কাঁচের চুড়ির শব্দ পাওয়া যায়।

অভাব তো আছেই। বেজায় অভাব। শুধু এই গ্রাম তো না, ভাটি অঞ্চলে কোনো খাওন নাই। তাই বইলা রাইতে-বিরাইতে বিদেশি লোকজন তোমার ঘরে আনাগোনা করব?

চাঁনসোনা ফিসফিস করে কী উত্তর দেয়, পরিষ্কার শোনা যায় না। নিয়ামত খা গলা খাকারি দিয়ে বলেন, তুমি এই গেরাম ছাইড়া যাও গিয়া।

কই যামু,কন?

বাপের বাড়ির দেশে যাও। ভাই-বেরাদরের সাথে গিয়া থাক।

বাপের বাড়িত আমার কেউ নাই।

তুমি মানুষের চউখের উপরে আকাম-কুকাম করতাছ। এর আগেও দুইবার খবর দিছি। দেই নাই? তোমার গেরাম ছাড়ন লাগব চাঁনসোনা।

মনির মিয়ারে কী করমু? হে কী খাইব?

তার ব্যবস্থা হইব। রুজিরোজগারের মালিক আল্লাহ্‌পাক। তুমি-আমি কেউ না।

দরজার ওপাশ থেকে ক্ষীণ স্বরে কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায়। নিয়ামত খাঁ ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি থাক, কিন্তু খবরদার, আর যেন কিছু না শুনি।

নিয়ামত খাঁর গলায় মমতা টের পাওয়া যায়। মমতার কারণ স্পষ্ট নয়। আলোচনা শুরুর আগে তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন এইজাতীয় মেয়েছেলে গ্রামে রাখা যাবেনা। জোয়ান ছেলেপুলের চরিত্র নষ্ট করবে। এরা থাকুক যেখানে তাদের মানায়, সেখানে। গঞ্জের খুপরিতে। সন্ধ্যায় পান খেয়ে ঠোঁট লাল করবে। ঘরের দাওয়ায় অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকবে। ইশারা-ইঙ্গিত করবে, রঙ্গ-তামশা করবে। ঝুনঝুন করে বাজাবে লাল কাঁচের চুড়ি। কুপির লাল আলো পড়বে তাদের গিল্টি-করা গয়নায়। গয়না ঝিকমিক করবে। চাঁনসোনার মতো মেয়েদের এই একমাত্র গতি।

বড়-বড় অভাবের সময় এরকম দু-একটা মেয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। এটা নতুন কিছু না, আগেও গিয়েছে। এদের যাওয়াই উচিত। তবু শেষ সময়ে নিয়ামত খাঁ আপোসের স্বর বের করছেন শুনে সবাই অবাক হয়। মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। এর মানে কী? নিয়ামত খাঁ তাদের অস্বস্তি টের পান। মুখ থেকে দয়া ভাব মুছে ফেলে কঠিন স্বরে বলেন, তবে একটা কথা চাঁনসোনা, এম্নে থাকন সম্ভব না, তোমারে নিকা করন লাগব। আমার কথা বুঝছ?

মাতব্বররা এবার নড়েচড়ে বসেন। আলোচনার এই অংশটা তাদের ভালো লাগে। চাঁনসোনার শরীরে অভাব-অনটনের ছাপ নেই। গোলাকার মুখে স্নিগ্ধ ছায়া। গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল-গৌর। চুলের গোছা নদীর ঢেউয়ের মতো ঢেউ তুলে হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে।

বিয়া-শাদি কইরা থাকবা ভদ্রলোকেরা মাইয়ার মতো। কাজ-কাম করব।

কে আমারে বিয়া করব?

নিয়ামত খাঁর গা জ্বলে গেল। কত বড় সাহস, নিজের মুখে বিয়ের কথা বলছে, একটুও আটকাচ্ছে না। গলার স্বরেও কোনো রকম অস্পষ্টতা নেই। তিনি নিজেকে সামলে শান্ত গলায় বললেন, শখ কইরা কেউ তোমারে বিয়া করত না। দয়া কইরা করব।

কে করব এই দয়া? আফনে?

চুপ হারামজাদি, যত বড় মুখ না তত বড় কথা! শইল্যে তেল বেশি হইছে? তর একটা উবগার করতে চাই, তুই বুঝস না?

তুই-তোকারি কইরেন না।

নিয়ামত খাঁ স্তম্ভিত হন। অন্য মুরুব্বিরা উদাস চোখে তাকান। ঘন-ঘন মাথা নাড়েন। কী অবস্থা! মেয়েমানুষ, কিন্তু কী তেজ। এমন তেজ ভালো না। এমন তেজের কপালে লাথি।

চাঁদসোনা খুনখুন করে কাঁদে। সেই সঙ্গে ঘন-ঘন চোখ মোছে। কাঁচের চুড়ি বেজে ওঠে তখন। বিধবা মেয়েমানুষ, কিন্তু হাতে চুড়ি। পরনে ছাপের শাড়ি। স্বামীর মৃত্যুর পর সাত বিধবা গিয়েছিল চাঁনসোনার কাছে। গোসল দেবে। গোসলের পর রঙিন শাড়ি বদলে সাদা শাড়ি পরিয়ে দেবে। চাঁনসোনা রাজি হয় নি। সে সাদা শাড়ি পরবে না। এই মেয়ে যে শেষমেষ এক কাণ্ড করবে, সেটা তো জানা কথা। এখন আবার কাঁদতে শুরু করেছে। মাররা বড় বিরক্ত হন। মোত্তালেব মিয়া উদার গলায় বলে, কাইলো না। খামাখা কান্দ ক্যান? তোমারে মারছি না ধরছি?

চাঁনসোনা ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলে, আমি এই গেরামে থাকুম না।

যাইবা কই?

হেইটা দিয়া আপনে কী করবেন? যাইতে কইছেন, যাইতেছি।

আরে, এইটা তো বদ মেয়েমানুষ।

চাঁনসোনা গ্রাম থেকে জন্মের মতো যাবে, এটাই সাব্যস্ত হল। তার আগে চাঁনসোনার মাথা মুড়িয়ে দেবার প্রস্তাব উঠেছিল। নিয়ামত রাজি হন নি। মুখে বিরক্তির ভঙ্গি করে বলেছেন, শইল দেখাইয়া খাইব। চুল কাটলে হে দেখাইব কী? বাদ দেও।

পুরোপুরি বাদ অবশ্যি দেওয়া হয় না। দশ ঘা জুতার বাড়ি দেওয়া হয়। সেই দৃশ্য দেখার জন্যে সমস্ত গ্রামের লোক ভেঙে পড়ে। অভাব-অনটনের মধ্যে দীর্ঘদিন পর প্রবল উত্তেজনার একটা ব্যাপার ঘটে। দশ ঘা জুতার বাড়ি খেয়েও মেয়েটার চোখে পানি আসে না কেন, এই নিয়ে তুমুল আলোচনা হয়।

মনিরউদ্দিন তার মামির বিদায়ের ব্যাপারটি সহজভাবেই নিল। কান্নাকাটি করল না, সঙ্গে যাবার বায়না ধরল না—একবার শুধু বলল, আর আসবা না?

আসমু, আবার আসমু। এই গেরামে আমার কবর হইব। বুঝছস?

মনিরউদ্দিন কিছুই বুঝল না। কিন্তু মাথা নাড়ল, যেন সে বুঝেছে।

একটা কথা মন দিয়া হু মনির মিয়া-মাইয়ামাইনষের উপরে কোনোদিন বেজার হইস না। এরা না পাইরা অনেক কিছু করে, না বুইজ্যা করে।

তুমি আবার আসবা?

একবার তো কইলাম। কয়বার কওন লাগব রে বোকা বান্দর?

মনিরউদ্দিন দেখল, মামি যাবার আগে সাজগোজ করছে। একটা ভালো শাড়ি পরেছে। চোখে কাজল দিয়েছে। সুন্দর লাগছে মামিকে।

তুই কোনো চিন্তা করি না। তুই এই গেরামের পুলা। তরে এরা দেখাশুনা করব। মানুষ পাষাণ হয় নাই। মায়া-মুহত মানুষের মধ্যে আছে।

তুমি কই যাইছ?

জানি না। যখন ছোট ছিলাম, তখন আমার বাপ মরল, মা বিয়া করল মই ধ্যম নগরের এক বেপারিরে। তারপর আর মার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ নাই। এখন পরথম যাইবাম মইধ্যম নগর। তারপরে দেখি। অনেক দূরের পথ। উজানের দেশ।

চাঁনসোনা মনিরউদ্দিনকে নিয়ামত খাঁর বাংলাঘরে বসিয়ে বেশ সহজ ভঙ্গিতে কেরাইয়া নৌকায় উঠল। ভাদ্র মাসের কানায়-কানায় ভরা নদী—একূল থেকে ওকূল দেখা যায় না। চাঁনসোনা টিনের ট্রাংকের উপর বসে আছে মূর্তির মতো। নৌকার মাঝি বলল, ওগো ভালোমাইনষের মাইয়া, ছইয়ের ভিতরে গিয়া বসেন।

চানসোনা জবাব দিল না। যেভাবে বসে ছিল, সেভাবেই বসে রইল। কতকাল আগে এক শ্রাবণ মাসে তের বছরের চাঁনসোনা এই গ্রামে এসেছিল। লম্বা ঘোমটার ফাঁকে অবাক হয়ে দেখেছিল ভাটি অঞ্চল। অচেনা এই জায়গাটির জন্যে কেমন এক ধরনের মমতা জন্মেছিল। আজ সেই মমতা বহুগুণে বেড়ে তাকে ভাসিয়ে নিতে চাইছে। এতটুকু মাত্র শরীর মানুষের, এত মমতা সে কোথায় ধারণ করে?

নৌকার মাঝি বলল, কাইন্দেন না মা। মনটারে পাষাণ করেন। ছইয়ের ভিতরে গিয়া বসেন। পানি দেখলেই চউক্ষে বেশি পানি আসে। পানি খুব নরম জিনিস গো ভালোমাইনষের ঝি, খুব নরম জিনিস।

৫. নিবারণ ওঝার বয়স

নিবারণ ওঝার বয়স সত্তরের উপরে।

দড়ি-পাকানো চেহারা। মুখটি অসম্ভব ক্ষুদ্র। বছর দশেক আগে বা চোখে মানকাঁটার খোঁচা লেগেছিল। সেই চোখটি নষ্ট। অন্য চোখটি অস্বাভাবিক লাল। লাল চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ। রাতে সব কিছুই ছায়া-ছায়া মনে হয়। দিনে রোদের আলোয় চোখ মেলতে পারে না। করকর করে। সারাক্ষণই চোখ থেকে আঠাল কষের মত পানি ঝরে। বড় কষ্ট হয়। সার্বক্ষণিক কষ্টও এক সময় সহ্য হয়ে যায়। নিবারণ চোখের যন্ত্রণা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে পারে। গত বছর গঞ্জের হাসপাতালে গিয়েছিল। ডাক্তার চোখে টর্চের আলো ফেলে বিরক্ত মুখে বললেন, আপনি কী করেন? চাষবাষ না অন্য কিছু?

নিবারণ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমি ওঝা। সাপের বিষ ঝাড়ি।

কড়ি চালনা জানেন?

তা জানি। জানুম না ক্যান? বিদ্যা শিখছি।

কোনোদিন কড়ি চালনা করে সাপ এনেছেন?

জ্বে আজ্ঞে, আনছি।

মিথ্যা কথা বলতে মুখে আটকায় না? সত্যি কথা বলেন, নয়তো অষুধ দেব না।

ডাক্তার কেমন নিষ্ঠুরের মতো তাকিয়ে থাকেন। বিড়বিড় করে বলেন, এইসব ঝাড়ফুকের ওস্তাদরা গরিব মানুষগুলিকে লুটেপুটে খাচ্ছে।

কী অদ্ভুত কথা! লুটেপুটে খেলে নিবারণের আজ এই অবস্থা? নিবারণের জ্যাঠার ছেলে কৃষ্ণ যদি খাবার নিয়ে আসে, তাহলেই তার খাওয়া হয়। কৃষ্ণ একবারই খাবার আনে-দুপুরে। সকাল থেকে নিবারণ ভাবে, আজ কী খাবার আনবে কৃষ্ণ? প্রায়ই মিলে যায়। তখন বড় আনন্দ হয়।

আজ কেন জানি মনে হচ্ছে কৃষ্ণ ভালো কিছু আনবে। ঘুম ভাঙার পর থেকেই মনে হচ্ছে। খিদেও এই কারণে খুব জানান দিচ্ছে।

ঘরে কিছু মুড়ি আছে। মুড়ি খেয়ে কয়েক ঢোক পানি খেলে হয়। কিন্তু নিবারণের উঠতে ইচ্ছা করছে না। খিদে নষ্ট করে লাভ নেই। কৃষ্ণ যদি সত্যি-সত্যি ভালো কিছু আনে!

তার খড়ের ছাউনির একচালাটির তার মতোই অন্তিম দশা। গোলঞ্চ আর বয়রা গাছের জঙ্গল চালটিকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। এই অঞ্চলের এত নামী একজন ওঝার বাসস্থানটি দেখে চমকে যেতে হয়।

জলিল মিয়াও চমকে গেল। বাড়ির উঠোনে নিবারণ ওঝা বসে আছে। লাল চোখে তাকিয়ে আছে একসারি পিপড়ার দিকে। কিছুক্ষণ পরপরই প্রবল বেগে মাথা চুলকাচ্ছে। মাথায় চুল নেই বললেই হয়। অল্প যা আছে, তাতে জটা ধরেছে। জলিল বলল, নিবারণ ভাই ভালো আছেন?

নিবারণ মাথা চুলকানো বন্ধ করে ঠাণ্ডা গলায় বলল, কোন গ্রাম?

বানিয়াবাড়ি।

নৌকা আনছেন?

আনছি।

রুগী পুরুষ না মাইয়া?

পুরুষ।

আইছা। বসেন, জামাটা গায়ে দিয়া আসি।

বসার কোন জায়গা নেই। জলিল দাঁড়িয়ে রইল। নিবারণ ওঝার সঙ্গে আর কেউ বোধহয় থাকে না। বাড়ির ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসছে না। জলিল মিয়াকে দীর্ঘ সময় একা-একা দাঁড়িয়ে থাকতে হল। জামা গায়ে দিতে নিবারণ ওঝার এত সময় লাগার কথা নয়।

একটু দেরি হইল। মুড়ি ছিল চাইরডা, খাইলাম। খিদা লাগছিল।

জলিল মিয়া লক্ষ করল, নিবারণ বেশ ফর্সা একটা ফতুয়া গায়ে দিয়ে এসেছে। পায়ে রবারের জুতা।

আপনেরে পান-তামুক কিছু দিতে পারলাম না। ঘরে কিছু নাই।

কিছু দরকার নাই নিবারণ ভাই। আপনেরে পাওয়া গেছে, এইটাই বড় কথা।

আপনের নাম কি?

জলিল।

রুগী আপনের কে হয়?

আমার কিছু হয় না। দোস্ত মানুষ।

কাটছে কোন সময়?

ভোররাইতে।

আপনেরে একটা কথা কই। রুগী বাঁচানি মুশকিল হইব। মঙ্গলবারে কাটছে। শনি আর মঙ্গল এই দুই দিনে সাপের বিষের তেজ থাকে বেশি। বুঝলেন বিষয়ডা?

জলিল জবাব দিল না। সে লম্বা-লম্বা পা ফেলছে। নিবারণকে যত তাড়াতাড়ি গ্রামে নিয়ে উপস্থিত করা যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু নিবারণ হাঁটতে পারছে না। একটা পা টেনে-টেনে সে যাচ্ছে। এই লোকটিরও সময় বোধহয় শেষ হয়ে আসছে। থামতেও হচ্ছে নানান জায়গায়। গ্রামের মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। হাজারো প্রশ্ন করছে।

কোন গ্রামে?

কারে কাটল?

ক্যামনে কাটল?

বয়স কত?

কী সাপ?

জলিল এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোনো আগ্রহ বোধ করছে না, কিন্তু নিবারণ করছে। সে শুধু যে দীর্ঘ সময় নিয়ে উত্তর দিচ্ছে তাই নয়, উত্তরের শেষে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে শনি-মঙ্গলবারে কৃষ্ণপক্ষের সময় সাপে-কাটা রুগী বাঁচান অসম্ভব ব্যাপার। অন্য কোন ওঝা হলে ঘর থেকেই বেরুত না, সে বলেই বেরুচ্ছে।

নৌকায় উঠেও নিবারণের কথা বন্ধ হল না। নিজের মনেই বকবক করতে লাগল। তার মূল বক্তব্য হচ্ছে, ওঝাগিরি করে তার লাভের মধ্যে লাভ হয়েছে স্বাস্থ্য নষ্ট, মনের শান্তি নষ্ট। বাড়িতে দালান-কোঠা ওঠে নি। সিন্দুক টাকাপয়সায় ভর্তি হয় নি। কারণ রুগীর কাছ থেকে টাকাপয়সা নেওয়া ওস্তাদের নিষেধ। অবশ্যি রুগী ভালো হয়ে গেলে পরবর্তী সময়ে যদি পালাপার্বণে খুশি হয়ে কেউ কিছু দেয় তাতে দোষ হয় না। কিন্তু কেউ দেয় না।

সব ঠনঠন। বুঝলা, ঠনঠন। দুই বেলা পেটে ভাত হয় না।

শিখলেন ক্যান এই কাম?

জানি না ক্যান শিখলাম, অখন পস্তাই। রাইতে ঘুম হয় না। বিছানার কাছে সাপ আনাগোনা করে। এরা সুযোগে আছে। বুঝলা, সুযোগ খুঁজছে। আমার দিনও শেষ।

বয়স কত আপনের?

কে জানে কত! হিসাবপত্তর নাই।

বিয়া-শাদি করেন নাই?

করছিলাম। বৌটা মরছে সাপের কামড়ে। ঘরে ছিলাম না। এই সুযোগে কাম শেষ করছে।

নিবারণ একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

সারা রাইত বাত্তি জ্বালাইয়া রাখতে হয়। সাপের আনাগোনা জ্বালাইতে কেরোসিন লাগে, কে দিব কেরোসিনের পয়সা।

জলিল দ্রুত বৈঠা ফেলছে। বাতাস দিচ্ছে। বাতাস কেটে যেতে হচ্ছে বলেই বড় পরিশ্রম হচ্ছে। বুদ্ধি করে আরেকজন কাউকে সঙ্গে করে আনলে হত। নিবারণ চোখ বন্ধ করে আছে। সম্ভবত ঘুমিয়েই পড়েছে।

জলিল লক্ষ করল রোদের তেজ একটু যেন কম। তার বুকে ছাৎ করে উঠল। ঢল নামবে না তো? সর্বনাশ হয়ে যাবে। ধান কটা মাত্র শুরু হয়েছে। অবশ্যি আকাশ চকচকে নীল।

এক খণ্ড মেঘও নেই। তবু জলিলের মনে হল, রোদের তেজে ভাটা পড়েছে। নিশ্চয়ই মনের ভুল।

বানিয়াবাড়ির মাটিতে নেমেই নিবারণ গম্ভীর মুখে ঘোষণা করলনয়া মাটির পাতিলে এক পাতিল কালা গাইয়ের দুধ লাগব। একটা পাঁচহাতি গামছা, স্বর্ণসিন্দুর আর তালমিছরি লাগব।

গ্রামে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। ওঝা বিষ ছাড়াতে এসেছে, এমন উত্তেজনার ব্যাপার দীর্ঘদিন এই গ্রামে ঘটে নি। গ্রামের সব মানুষ ভেঙে পড়ল মনিরউদ্দিনের বাড়িতে।

নিবারণ ওঝা হাঁটছে রাজকীয় চালে। তার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। কথাবার্তা তেমন বলছে না। মাঝে হঠাৎ দাঁড়িয়ে সন্দেহজনকভাবে চারদিকে তাকাচ্ছে। সবাই থমকে দাঁড়াচ্ছে। তাদের কৌতূহল যখন তুঙ্গে, তখনই আবার সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করছে।

জীবন এবং মৃত্যুর মুখোমুখি একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। নিবারণ ওঝা হয়তো এ-মানুষটিকে বাঁচিয়ে তুলবে, হয়তো তুলবে না। এই সময়টির মতো রহস্যময় সময় আর কী কতে পারে?

মনিরউদ্দিনকে উঠোনের মাঝখানে একটি জলচৌকিতে বসানো হয়েছে। হয়তো সূর্যের আঁচেই তার মুখ লাল হয়ে আছে। চোখের কোণ ফোলা-ফোলা।

নিবারণ নতুন গামছা পানিতে ভিজিয়ে মনিরউদ্দিনের মুখ মুছিয়ে গামছাটা তার কাঁধে জড়িয়ে দিল। শান্ত গলায় বলল, হাত-মুখ ধোয়ার জল দেন আমারে। কালা গাইয়ের দুধ জোগাড় হইছে?

জানা গেল দুধের জোগাড় এখনো হয় নি।

কাঁইক্যা মাছের দাঁত দরকার। চাইর-পাঁচটা নতুন কলাপাতা আনেন। পিতলের কলসিতে এক কলসি জল দেন। আর শুনেন মা সকল, আপনারার মধ্যে যারা বিধবা, তারা মন্ত্র পড়ার সময় দূরে থাকবেন। অপরাধ নিয়েন নাগগা মা সকল। এইটাই হইতাছে নিয়ম।...

পুলাপানরে দূরে থাকতে কন। এইটা রঙ্গ-তামাশার জায়গা না। বড় কঠিন। সমস্য।

কালো গাইয়ের দুধ এসে পড়েছে। নিবারণ মনিরউদ্দিনের সাপে-কাটা পায়ের গোড়ালি দুধে ডুবিয়ে মুখ অন্ধকার করে ফেলল।

বিষ খুব তেজী। উঠছে অনেক দুর। কালনাগের বিষ। বড় কঠিন সমস্যা।

মন্ত্রপাঠ শুরু হল। ছোটখাটো নিবারণ ওঝা, এখন একজন বিশাল ব্যক্তিত্ব। তার কণ্ঠ গমগম করছে–

ও বালা লখিন্দররে...
কোন কাল ভুজঙ্গ তরে খাইলরে!......

এতগুলি মানুষ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিবারণ ওঝার মন্ত্র ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। এক সময় নিবারণ ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। বড়-বড় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। ঠিক তখন শরিফার কান্নার শব্দ শোনা গেল। সে কাঁদছে ক্ষীণ স্বরে। কিন্তু মাঝে। মাঝে ক্ষীণ স্বরও তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মনিরউদ্দিন আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, তিয়াষ লাগছে, পানি দে। ও শরিফা, শরিফা।

তার চারপাশে এতগুলি মানুষ, কিন্তু সে নির্লজ্জর মতো স্ত্রীকে ডাকছে।

নিবারণ বলল, পানি অখন খাইয়েন নাগগা বাপধন। তালমিছরির টুকরা চোষেন। পানি খাইলে শরীর টিলা হইয়া যাইব।

হউক টিলা ও শরিফা, পানি দে।

নিয়ম-কানুন তো আছেগগা বাপধন।

থাউক নিয়ম-কানুন ও শরিফা, শরিফা।

নিবারণ হতাশ ভঙ্গিতে তাকাল সবার দিকে, তারপর এমনভাবে মাথা নাড়ল, যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সে কোনো আশা দেখছে না।

জলিল কড়া ধমক দিল, মনির, ওঝা যা কইতেছে হোন।

পানির তিয়াষ লাগছে।

তিয়াষ লাগছে পানি খাইবা। এট্টু সবুর কর।

অনেকেই কথা বলে উঠল। সবারই একই বক্তব্য, সবুর কর। নিবারণ বাঁ হাতে এক চিমটি স্বর্ণসিন্দুর নিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুতোর সঙ্গে মন্ত্রপাঠ শুরু করল–

ভৈরবী ছিন্নমস্তা, চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।

বগলা সিন্ধাবিদ্যা চ মাতাঙ্গি কমলাত্রিকা।

এতো দশমহাবিদ্যাঃ সিন্ধাবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিকা।......

নিবারণের মুখে ফেনা জমে উঠছে। রক্তবর্ণের চোখে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা। তাকে এই জগতের মানুষ বলে এখন আর মনে হচ্ছে না। অনেকখানি দূর থেকে ডান হাত ঘোরাতে ঘোরাতে সে ছুটে আসছে। থমকে দাঁড়াচ্ছে মনিরউদ্দিনের সামনে। ঝড়ের বেগে নেমে আসছে ঘুরন্ত হাত। সেই হাত গিয়ে পড়ছে মনিরউদ্দিনের উরুতে। মনিরউদ্দিন প্রতিবারই ধমকে উঠছে—আহু, কী করেন?

নিবারণ অতি দ্রুত কী-সব বলছে তা এখন আর বোঝার উপায় নেই। শব্দ হচ্ছে। মৌমাছির গুঞ্জনের মতো। কতক্ষণ এরকম চলবে কে জানে?

৬. ময়মনসিংহ থেকে উত্তরের দিকে

ময়মনসিংহ থেকে উত্তরের দিকে যে-ব্রাঞ্চ লাইনটি গিয়েছে, তার শেষ স্টেশনটির নাম মোহনগঞ্জ। স্থানীয় লোকজন একে উজান দেশ বলেই জানে, যদিও নাবাল অঞ্চলের শুরু এখান থেকেই। শুকনো মরশুমে কিছু বোঝার উপায় নেই। দিগন্তবিস্তৃত বৃক্ষহীন বিশাল মাঠ। এঁকেবেঁকে তার ভেতর দিকে চলে গেছে পায়ে-চলা পথ। সেই পথ ধরে উত্তরে যাওয়া মানেই ভাটি অঞ্চলে গিয়ে পড়া। চট করে কিছু বোঝার উপায় নেইউজান দেশেও এরকম বিশাল মাঠ আছে, কিন্তু ভাটির মাঠগুলি কেমন যেন অন্যরকম। এই মাঠের হাওয়ায় কিছু-একটা যেন আছে। এ-অঞ্চলের সঙ্গে পরিচয় নেই এমন মানুষজন এক ধরনের চাঞ্চল্য অনুভব করেন। তাঁদের কাছে মনে হয় এমাঠ শুধু মাঠ নয়, এর অন্য কোন পরিচয় আছে।

সে-পরিচয় বোঝা যায় বর্ষায়। কী বিপুল পরিবর্তন। মাঠ কোথায়, এ তো বিশাল সমুদ্র। জল থৈথৈ করছে চারদিকে। প্রকাণ্ড সব ঢেউ উঠছে, গুমগুম শব্দ আসছে কোনো গোপন জায়গা থেকে। এ কেমন দেশ।

অচেনা মানুষের কাছে মনে হতে পারে এ বোধহয় বিরান জলাভূমি। সহজে কিছু চোখে পড়বে না। বিশাল জলরাশির মধ্যেই খানিকটা উঁচু জায়গা। অল্প কিছু ঘর নিয়ে ছোট্ট জনপদ। হাওড়ে দিক-হারিয়ে-ফেলা কোনো নৌকার মাঝি চিৎকার করলে এরা সাড়া দেবে। রাতের বেলা লণ্ঠন ঝুলিয়ে আলো দেখাবে।

এরা ছ মাস থাকবে জলবন্দি অবস্থায়। সেটাই সম্ভবত তাদের সুখের সময়। কাজকর্ম নেইগান-বাজনা, বাঘবন্দি খেলা, আর লম্বা ঘুম। এ-সময়ে এখানকার মানুষদের শরীরে নেমে আসে অদ্ভুত এক আলস্য। মেজাজ হয়ে যায় রাজা-বাদশাদের মতো।

বিয়ে-শাদির উৎসবে জমানোটাকাপয়সা সব খরচ করে ফেলে। তারপর এক সময় জল নেমে যায়। জেগে ওঠে থকথকে কাদার মাঠ। পলিভতি সোনা-ফলানো জমি। ভাটি অঞ্চলের মানুষরা গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। শুরু হয় অমানুষিক পরিশ্রম। জমি তৈরি হয়, ফসল বোনা হয়। ফসল কেটে ঘরে তুলে তারা আবার জলবন্দি হয়ে যায়। বড় সুখের সময় সেটা।

বানিয়াবাড়ি এরকমই একটি গ্রাম তিনটি বিশাল হাওড় একে জড়িয়ে ধরে আছে। উত্তরে নাও ডুবির হাওড়। দক্ষিণে ও পশ্চিমে পাগলা হাওড়। পুবে মতিবিবির হাওড়।

মতিবিবির হাওড়ের পানি শীতেও পুরোপুরি শুকায় না। থকথকে কাদার উপর হাত তিনেক পানি থাকে। রাজ্যের দেশান্তরী পাখি উড়ে আসে। নাও ডুবির হাওড় এবং পাগলা হাওড়ের পানি শুকিয়ে যায়। চাষবাষ হয়।

বানিয়াবাড়ি খুব ছোট গ্রাম নয়। প্রায় সত্তরটির মত ঘর আছে। পাকা বাড়ি আছে দুটি। সবচেয়ে বড়টির বর্তমান ওয়ারিশান হচ্ছেন গোলাম আলি। তিনি ভাটি অঞ্চলে থাকেন না। উজান দেশে বাসাবাড়ি বানিয়েছেন। পানির উপর দিয়ে আসা ভেজা বাতাস তাঁর সহ্য হয় না। তিনি বছরে এক বার ভাগীদারদের কাছ থেকে ফসলের ভাগ নিতে আসেন, এবং যাবার সময় কিছু জমি বিক্রি করে যান। জমির উপর যাদের বেঁচে থাকা, তারা জমি বিক্রি কখনোই ভালো চোখে দেখে না। গোলাম আলির জন্যে কেউ বিন্দুমাত্র মমতা পোষণ করে

না। বানিয়াবাড়িতে গোলাম আলির প্রসঙ্গ উঠলেই এরা বলে—গোলামের পুত গোলাম। গ্রামের দ্বিতীয় পাকা বাড়িটি বজলু সরকারের। লোকটি মহাকৃপণ। তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর মরক্ষার জন্যে তিনি পাকা বাড়ি করেন বলে সবার ধারণা। ধারণা সম্ভবত সত্যি। বজলু সরকার পাকা বাড়ির মতো ব্যাপারে পয়সা খরচ করবার মানুষ নন। গ্রামের পাঁচ-ছ ঘর পরিবার অসম্ভব ধনী, যদিও তাদের বাড়িঘর বা জীবনযাপন পদ্ধতি দেখে তা আঁচ করবার কোনো উপায় নেই। গ্রামের বাদবাকি মানুষদের তেমন কোন জমিজমা নেই। এ নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথাও নেই। অন্যের জমি চাষ করে তাদের দিনকাল খারাপ যায় না। হয়তো ভাটি অঞ্চলের প্রকৃতিই এদের খানিকটা নিয়তিবাদী করে দিয়েছে। অনিত্য এই জগৎ-সংসারে ঘরবাড়ি দালানকোঠার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই, এ-ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত গান এরা খুব আগ্রহ নিয়ে গায়।

মনিরউদ্দিন এর ব্যতিক্রম। তার মাথায় অল্প বয়সে একটা পোকা ঢুকে গেল। যেকরেই হোক নিজের একটা ঘর লাগবে। নিজের জমিজমা লাগবে। একটা নৌকা লাগবে। এখানেই শেষ নয়, বজলু সরকারের মতো একটি দোনলা বন্দুকও সে কিনবে।

এইসব স্বল্প সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মনিরউদ্দিনের বেলায় কেমন করে হয়ে গেল। টাকা জমানোর নেশায় পেয়ে বসল। জোয়ান বয়স, বর্ষার সময় উজান দেশে গিয়ে কাঁচা পয়সা ওড়াবে, গঞ্জের মেয়েদের সঙ্গে রঙ্গ-তামাশা করবে তা নয়, বাঁশ কেটে কাঁচা টাকা জমায়। ঈদ উপলক্ষে নতুন লুঙ্গিগেঞ্জি কেনার টাকা দেন বজলু সরকার, সেই টাকাও ফেলে দেয় মাটির ব্যাংকে। এবং একদিন সত্যি-সত্যি মুখ কাঁচুমাচু করে বজলু সরকারকে জানায় সে একটা ঘর বাঁধতে চায়।

বজলু সরকার বিরক্ত হয়ে বলেন, ঘর দিয়া তুই করবি কি? বাংলাঘরে ঘুমাইতে কোনো অসুবিধা আছে? অত বড় ঘর পইড়া আছে।

নিজের একখান ঘর......।

নিজের ঘর দিয়া কী করবি? বিয়া-শাদি করনের মতলব নাকি?

মনিরউদ্দিন চুপ করে থাকে। বজলু সরকার দরাজ গলায় বলেন, সময় হইলে বিয়া আমিই দিমু। জমির অভাব নাই। একখান ঘর বানাইয়া থাকবি। গেল ফুরাইয়া। যা, কাম কর্ গিয়া।

একখান নিজের ঘর করতাম চাই।

নিজের ঘর, নিজের ঘর, বিষয় কি?

জমি কিন্যা ঘর বানাইতাম চাই।

তুই জমি কিনবি? পয়সা কই পাইবি?

জমাইছি।

কত জমাইছ? যা, নিয়া আয়।

টাকা তেমন কিছু না, কিন্তু এখানকার জমি সস্তা। ঘর বানানোর মতো জমি কেনা যায়।

বজলু সরকার গম্ভীর হয়ে বলেন, টাকা নষ্ট করনের দরকার দেখি না। ঘর। বানাইবার শখ হইছে, ঘর বানা। পুরান ভিটার কাছে আমার জমি পইড়া আছে। জংলা সাফ কইরা ঘর তোল।

টেকাডি রাইখ্যা দেন।

নিজের কামলার কাছে জমি বেচুম, পাইছস কি তুই আমারে? ঐটা তুরে দিলাম আমি, যা ভাগ।

একটা দলিল।

আরে ব্যাটা আমারে দলিল দেখায়......হইব,হইব। দলিলও হইব। যা যা, বিরক্ত করিস না।

দেখতে দেখতে মানকচু আর হেলেঞ্চার জঙ্গল কেটে চমৎকার একটা ঘর তুলে ফেলল মনিরউদ্দিন। বজলু সরকার সেই ঘর দেখে কেন জানি অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলেন। লোকজনদের বলতে লাগলেন, পিরীতির গন্ধ পাই। হারামজাদা পিরীত করছে—অখন বিয়া করব। ঘর সাজায়। পাখনা উঠছে হারামজাদার।

পিরীতির ব্যাপারটা সত্যি নয়। তবে ঘর সাজানোর ব্যাপারে মনিরউদ্দিনের উৎসাহের সীমা নেই। গঞ্জে গেলেই এটাসেটা কিনে আনছে ঘরের জন্য। একবার কিনল একটা কাঠের চেয়ার। বিরাট ওজন সেই চেয়ারের। শীতের মরসুমে গঞ্জ থেকে সেই চেয়ার ঘাড়ে করে

আনতে হল তাকেই। এগার মাইল রাস্তা—সোজা কথা নয়। পিঠের ব্যথায় কাজে যেতে পারে না। শুয়ে থাকতে হয় দু দিন।

বজলু সরকারের স্ত্রী রহস্য করে বলেন, কেমুন চিয়ার দেখন লাগে। হাতির মতো জোয়ানও কাবু হইছে। চিয়ারটা আমরারে দেখাইসরে মনির......।

গরিব মানুষের চিয়ার আম্মা।

তুই অখন আর গরিব কই? থানার দাবোগা আইলে অখন তোর বাড়িতে গিয়া উঠব। চিয়ার আছে, টেবিল আছে।

টেবিল নাই।

অখন নাই, দুই দিন পরে হইব।

টেবিল হয় না, তবে গ্রামের লোকজন অবাক হয়ে দেখে, মনির টিন কিনেছে। টিনের ঘর বাঁধবে। ব্যাপারটা কি, কেউ বুঝতে পারে না। বজলু সরকার বলেন, বেকুব মানুষ, কি করবা কও? দুই দিন পরে দেখবা ইট কিনছে, দালান দিব।

সত্যি-সত্যি এক বর্ষায় নৌকায় করে একগাদা ইট কিনে আনে মনিরউদ্দিন। বজলু সরকার চোখ কপালে তুলে বলেন, বিষয় কী?

মনিরউদ্দিন নিচু গলায় বলে, উঠানের মইধ্যে দিমু। বাদলার সময় বড় প্যাককাদা হয়।

হইছে কি তোরক দেহি! ভূতে ধরছে, না জিনে ধরছে? ব্যাটা, তুই জমিদার হইছ?

বজলু সরকারের স্ত্রী বললেন, এরে বিয়া দেন : বিয়ার সময় হইলে মরদমাইনষে উল্টাপাল্টা কাম করে।

এরে বিয়া করব কে? পাগল-ছাগল!

বিয়ের ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায় না। এককেকটা বর্ষা যায়, নতুননতুন কিছু জিনিসপত্র আসে তার বাড়িতে।

তারপর এক সময় প্রায় জোর করেই বজল সরকার তার বিয়ে দিয়ে দেন। মেয়ে। পাশের গ্রাম কলমাকান্দার। হতদরিদ্র বাবা-মার ছ ছেলেমেয়ের সবচেয়ে বড় মেয়ে শরিফা। চোদ্দ বছরের রোগা একটি মেয়ে। সে স্বামীর সম্পত্তি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়। কী সুন্দর টিনের ঘর। ঘরের ভেতর কাঁঠালকাঠের বিশাল সিন্দুক। সে ভয়ে-ভয়ে বলে, কী আছে সিন্দুকে?

মনির উদাস গলায় বলে, কিছু নাই। একদিনে কিছু হয় না। আস্তে আস্তে হয়। সিন্দুকটা ঝাড়পোছ কবি। ময়লা না-হয় যেন। খবরদার।

শরিফা বাধ্য মেয়ের মতো মাথা নাড়ে। নতুন বৌকে মনিরের বড় ভালো লাগে। কিন্তু এই কথাটি বৌকে সে জানতে দিতে চায় না। জানলে লাই পেয়ে যাবে।

মেয়েজাতকে লাই দিতে নেই।

মনির বৌয়ের জন্যে শাড়ি কিনে আনে। অবহেলার সঙ্গে ফেলে রাখে সিন্দুকের উপর। হঠাৎ করে সেই শাড়ি পেয়ে শরিফার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করে, শাড়ি কার?

মনিরউদ্দিন এমন ভাব করে যেন শুনতেই পায় নি। তারপর নিতান্ত বিরক্ত মুখ করে বলে, শাড়ি পিন্দনের মানুষ এই বাড়িত আর কেউ আছে?

শরিফা কল্পনাই করতে পারে না, তিনটি শাড়ি থাকা সত্ত্বেও কেউ আরেকটি শাড়ি কিনতে পারে। সে দীর্ঘ সময় নাকের সামনে শাড়িটা ধরে রাখে। নতুন শাড়িতে মাড়ের গন্ধটা তার বড় ভালো লাগে।

শুধু শাড়ি নয়, আরো সব জিনিসপত্র কাঠের সিন্দুকের উপর পড়ে থাকতে দেখা যায়। মি ের কৌটা। এক শিশি গন্ধরাজ তেল। এক জোড়া স্পঞ্জের স্যান্ডেল। এত সৌভাগ্যে শরিফার ভয় করে। আবার বড় আনন্দও হয়। সব সময় ইচ্ছা করে স্বামীর জন্যে কিছু-একটা করতে। সেই সুযোগ বড়-একটা আসে না। মনিরকে ঘরেই পাওয়া যায় না। ভূতের মতো পরিশ্রম করে। সব সময় চিন্তা-কী করে বাড়তি দুটা পয়সা আসবে, মাটির ব্যাংক ভরে উঠবে-জমিজমা কিনবে। গোয়ালঘরে থাকবে নিজের গরু। গঞ্জে যাবে নিজের একটা নৌকায়। দিন কারোর একভাবে যায় না। আজ সে হতদরিদ্র। তার মানে এই নয় যে, সারা জীবন সে হতদরিদ্রই থাকবে। একদিন-না-একদিন সে দোনলা বন্দুক কিনবে। সেদিন খুব দূরে নয়।

গভীর রাতে মাঝে-মাঝে তার সে-সব স্বপ্নের কথা সে শরিফাকে বলে।

ও শরিফা।

কিতা?

পাকা দালান দিমু, বুঝছস? দোতলা দালান।

শরিফা কিছু বলে না।

দেখবি একদিন, লাখের বাতি জ্বলব আমার বাড়িত।

লাখের বাতি কী জিনিস?

শরিফার অজ্ঞতায় মনির হাসে, ভেঙে কিছু বলে না। লাখের বাতি হচ্ছে পুরোনো কালের এক উৎসব। কেউ লক্ষপতি হলে একটি উৎসব করা হয়। সেই উৎসবে লম্বা বাঁশের মাথায় বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়। দূর-দূরান্তের মানুষ সেই বাতি দেখে এবং বলাবলি করে লাখের বাতি জ্বলছে।

শরিফা।

কিতা?

লাখের বাতি জ্বলব ঘরে, দেখিস। জ্বললে কেমন হইব ক দেহি?

কিছু না-বুঝেই শরিফা বলল, ভালেই হইব।

শইলে আছে কাম করনের শক্তি। শইলের শক্তিটাই আসল।

মনির একটা হাত রাখে শরিফার দিকে। শরিফার বড় লজ্জা লাগে, আবার ভালো লাগে।

৭. খবির হোসেন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে

খবির হোসেন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভিড়টা ছেলে-ছোকদের। একটি মানুষ সাপের কামড়ে মরতে বসেছে, অথচ বয়স্ক লোকজন কেউ নেই, এর কারণ কি? রহস্য কিছু-একটা নিশ্চয়ই আছে। জিজ্ঞেস করবার লোক নেই। জোহরের নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে। অজু করে আজান দিতে হবে। কিন্তু তাঁর উঠতে ইচ্ছা করছেন। এখানে যে-সব কাণ্ডকারখানা হচ্ছে সেসব দেখাও ঠিক হচ্ছে কি না তা বুঝতে পারছেন না। আল্লা-খোদর নাম নেওয়া হচ্ছে না, এটা কী ব্যাপার? একটা লোক ক্রমাগত হিন্দু দেব-দেবীর নাম বলে যাচ্ছে, এ কেমন কথা! ওঝাদের সাপের বিষ নামাতে তিনি আগেও দেখেছেন। সেখানে দেবদেবীদের নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করা হয় না। ওঝারা নানান রকম ছড়াটড়া বলে।

এই ওঝা সেরকম নয়। খবির হোসেনের মনে হল, এর দম ফুরিয়ে আসছে। মন্ত্রতন্ত্র বেশিক্ষণ চালাতে পারবে না। গত আধা ঘন্টায় সে তিন বার পানি খেয়েছে এবং খানিকটা পানি নিজের মাথায় ঢেলেছে। এই মুহূর্তে সে ফতুয়ার পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে উদাস ভঙ্গিতে টানছে, যেন সে সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। এখন হাত-মুখ ধুয়ে বাড়ি চলে যেতে চায়। কিংবা চারটা ডাল-ভাত খেয়ে কাঁঠালগাছের নিচে আরাম করে বসতে চায়।

খবির হোসেন বললেন, ভাই, আপনার নাম কি?

নিবারণ শব্দ করে থুথু ফেলে বিরস মুখে বলল, নিবারণ। আমার নাম নিবারণ। দশ গায়ের লোকে আমারে চিনে।

নিবারণের কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি। সে অপমানিত বোধ করছে।

কি রকম দেখছেন?

কিছু বুঝছি না।

বিষ নামছে?

উঁহুঁ। তেজ বেশি। মঙ্গলবার কৃষ্ণপক্ষের রাইতে কারবার হইছে। মুশকিলটা বুঝছেন? বেজায় মুশকিল।

না, বুঝছি না। কী মুশকিল?

নিবারণ অত্যন্ত বিরক্ত হল। কড়া-কড়া কিছু কথা বলতে গিয়েও বলল না।

খবির হোসেন মনিরউদ্দিনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে তিন বার সুরা এখলাস পড়ে একটা ফুঁ দেবেন। আল্লাহ্‌র পাক কালাম হচ্ছে সবার উপরে।

কেমন আছ মনির?

মনিরউদ্দিন চোখ তুলে তাকাল। তার চোখ লাল। সে কোনো জবাব দিল না।

ব্যথা আছে?

জ্বি।

দমে-দমে আল্লাহর নাম নেও। আল্লাহপাক হচ্ছেন রহম নেওয়ালা। আমাদের এক পয়গম্বর ছিলেন মাছের পেটে। দমদমে আল্লাহর নাম নিচ্ছিলেন। সেই কারণে......

একটু পানি দেন মৌলানা সাব।

আনতেছি, পানি আনতেছি।

খবির হোসেন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বাড়ির দিকে গেলেন। মেয়েছেলেতে বাড়ি ভর্তি। পাখির মত কিচিরমিচির করছে।

মনিরউদ্দিনরে পানি খাওয়ান লাগে।

ভেতর থেকে একজন কে চিকন গলায় বলল, ওঝা পানি দিতে নিষেধ করছে।

তিয়াষি মানুষ পানি চাইলে দেওয়া লাগে। পানি খাইলে কিছু ক্ষতি নাই। পানির উপরে আল্লাহতালার খাস রহমত আছে।

বড় একটা ঘটিতে এক ঘটি পানি এনে দিল শরিফা। এই মেয়েটিকেই তিনি রাতে ছুটে যেতে দেখেছেন। নিতান্তই বাচ্চা মেয়ে। কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে।

মা, চিন্তা কইরো না। এক দিলে আল্লারে ডাক।

মেয়েটি স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে, যেন সে আরো কিছু শুনতে চায়।

খবির হোসেন নরম গলায় বললেন, বাদ আছর আমি মসজিদে মিলাদ পড়ায়ে দিব। কোনো চিন্তা করবা না। ফি আমানুল্লাহ্। আল্লাহ্পাক আসান দেনেওয়ালা।

শরিফা ক্ষীণ স্বরে বলল, রইদে ফালাইয়া থুইছে, কষ্ট হইতাছে। ইনারে এট্টু ছায়াতে নিয়া যান মৌলানা সাব।

ঠিক, ঠিক। ছায়ার মইধ্যে নেওয়া দরকার। করছি, আমি ব্যবস্থা করছি।

মনিরউদ্দিন ঢকটক করে সবটা পানি খেয়ে ফেলল। এত তৃষ্ণা ছিল তার, কে জানত?

খবির হোসেন বললেন, এরে ছায়ার মধ্যে নিয়া বসাই, কোন বাধা আছে?

নিবারণ হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। নিজেই উঠে গিয়ে কাঁঠালগাছের ছায়ার বসল। অসহ্য গরম পড়েছে। মাটি থেকে ভাপ বেরুচ্ছে গরমে।

খবির হোসেন অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, নিবারণ মাথা নিচু করে বমি করছে। লোকটি অসুস্থ। খবির হোসেন এগিয়ে গেলেন। লোটার কষ্ট হচ্ছে।

কি হইছে আপনার?

শইল খারাপ। বয়স হইছে।

আসেন, মাথায় পানি ঢালি। তারপর শুয়ে থাকেন।

নিবারণ কোনো কথা বলল না। মৌলানা সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, লোকটি কাঁদছে।

আপনার শরীর কি বেশি খারাপ?

নিবারণ তারও জবাব দিল না। খবির হোসেনের খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

পেটে খিদা আছে? কিছু খাইবেন?

নিবারণ হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। আবার বমি করল। যে-ভিড় মনিরউদ্দিনকে ঘিরে ছিল তা এখন নিবারণের চারদিকে। নিবারণ তার লাল চোখে চারদিক দেখল, তারপর ধমক দিয়ে বলল, কী দেখ? এইটা কি রঙ্গ-তামাশা?

তার বলার মধ্যে কিছু একটা ছিল। কয়েকজন ছেলেপুলে একসঙ্গে হেসে উঠল। দুঃখে ও কষ্টে নিবারণের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল।

খবির হোসেন এক বদনা পানি জোগাড় করে নিবারণ ওঝার মাথায় ঢালতে লাগলেন। নিবারণ নড়াচড়া করছে না। বাধ্য ছেলের মতো মাথা পেতে বসে আছে। এক বদনা পানি শেষ হতেই সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আর এট্টু পানি দেন।

আরাম লাগছে?

হ।

খবির হোসেন পানির খোঁজে গেলেন। বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। মসজিদের ইমামতির কাজ-কঠিন দায়িত্বের কাজ। দুনিয়া একদিকে চলে গেলেও ঠিক সময়ে উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু তাঁর যেতে ইচ্ছা করছে না। বড় মায়া লাগছে। আল্লাপাকের লীলা বোঝা দায়। একদিকে মায়া দেন, অন্যদিকে মায়া টেনে নেন। কী আজব কারবার!

যা ভাবা গিয়েছিল, তাই। মসজিদ খাঁ-খাঁ করছে। একটা মানুষ নেই। পানির ড্রামটিও শূন্য। যাদের পানি তুলে রাখার কথা, তারা মনিরউদ্দিনের বাড়িতে বসে আছে বোধহয়।

খবির হোসেনের অজুর পানির দরকার নেই—তাঁর অজু আছে। কিন্তু যদি কেউ আসে? এই দুপুরের রোদে সে নিশ্চয়ই অজুর পানির জন্যে আবার হটবে না? কষ্ট কেউ করতে চায় না। একটু রোদ, একটু গরম—এতেই সবাই কাহিল। অথচ রসুলুল্লাহ্র দেশে আগুনের মতো গরম মরুভূমি। সেই গরমের দেশেও লোকজন নামাজের জন্যে মসজিদে আসে। নিশ্চয়ই বহু দূর থেকে হেঁটে-হেঁটে আসে।

একা-একাই খবির হোসেন নামাজে দাঁড়ালেন। সুরা ফাতেহা শেষ হওয়ামাত্র চট করে তাঁর মনে হল—সাপের কামড়ের কোনো দোয়া কি আছে? বোধহয় নেই। মরুভূমির দেশে নিশ্চয়ই সাপ নেই। থাকলে হাদিসটাদিসে উল্লেখ থাকত। কোনো একটা চিন্তা মাথায় ঢুকে

গেলে খুব মুশকিল। সেটা মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। শয়তানের কাজ। ইবলিশ শয়তানের কাজ। নামাজের সময় মানুষের মনকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়। শয়তানের ধোঁকার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছেন না, এই দুঃখে খবির হোসেনের মন ভার হয়ে গেল।

তিনি কথা দিয়ে এসেছেন, বাদ জোহর একটা মিলাদ পড়াবেন। হায় রে! একাএকা মিলাদ হয় নাকি? কিন্তু কথা দিয়ে এসেছেন, কথা রাখতেই হবে। কথা দিয়ে যে কথা রাখে না, তার জন্যে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কঠিন আজাব।

খবির হোসেন একাই মিলাদ পড়লেন। মসজিদঘরের এক পাশে কাসাসুল আম্বিয়া বইটি যত্ন করে রাখা। সেই বইটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ পাতা ওল্টালেন। এর প্রতিটি পাতা তাঁর অসংখ্যবার পড়া। কোথায় কি আছে, চোখ বন্ধ করে বলতে পারেন। তবু নতুন করে পড়া যায়। এই সমস্ত বই কখনো পুরোনো হয় না। কিন্তু আজ কিছুতেই মন। বসছে না। মনিরউদ্দিনের জন্যে মন টানছে।

খোদার তৈরি জীব মানুষ, আবার সাপও সেই খোদাতালারই সৃষ্টি। তবু কেন এই সাপ মানুষকে কামড়ায়? সাপের নিজের ইচ্ছাতে কিছু করার উপায় নেই, কারণ আল্লাহপাক পরিষ্কার বলেছেন—তাঁর হুকুম ছাড়া কিছুই হবে না। আজ যদি মনিরউদ্দিন মরে যায়, তাহলে সেটা ঘটবে আল্লাহ্‌র হুকুমে। কিন্তু কেন? খবির হোসেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি অনেক কিছুই বুঝতে পারেন না। তাঁর বুঝতে ইচ্ছা করে। তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি সেরকম নেই। থাকলে ভালো হত। কিন্তু কী আর করা যাবে, আল্লাহ্‌ সবাইকে সব জিনিস দেন

না। কেউ পায়—কেউ পায় না। কেন এরকম হবে? বাবা-মা তাদের সব শিশুকে সমান আদর করেন। তাদের সামান্য অসুখেবিসুখে অস্থির হন। কিন্তু......।

চিন্তাটা উল্টো দিকে যাচ্ছে। খবির হোসেন নিজেকে সামলে নিয়ে দোয়া করতে বসলেন। মনিরউদ্দিনের কথা আল্লাহ্কে গুছিয়ে বলতে গিয়ে তাঁর চোখ ভিজে উঠল।

অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, মনিরউদ্দিন ছোকরা তাঁকে দেখতে পারে না। রাস্তায় দেখা হলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। একদিন তিনি বলেই ফেললেন, রাস্তায় দেখা-সাক্ষাৎ হয়, তুমি আমারে সালাম দেও না, বিষয় কি কও দেখি?

মনিরউদ্দিন মুখ শক্ত করে থাকে। উত্তর দেয় না।

সালাম দেওয়া হজরতের সুন্নত। সুন্নত পালন না করলে কঠিন আজাব। পুলছিরাত পার হওন দায়। জিনিসটা খিয়াল রাখবা। আরেকটা কথা, নামাজে সামিল হও না কেন?

কাজকাম নিয়া থাকি।

তা তো থাকবাই। কৃষিকাজ হইল গিয়া তোমার ফরজে কিফা। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত আল্লাহপাকের সামনে খাড়া হওয়াও বড় ফরজ। খিয়াল রাখবা। দুই কান্দে দুই ফিরিশতা। বিনা কালির কলমে তারা লিখছে। মহাবিপদ সামনে।

তাতে কোনো লাভ হয় নি। এর পরও মনিরউদ্দিনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সে মুখ শক্ত করে রেছেছে। তিনি নিজেই আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ মনির?

জ্বি ভালো।

ভালো থাকলেই ভালো। তোমার বৌটা ভালো?

হুঁ।

আইচ্ছা আইচ্ছা, খুশির কথা। যার একদিন তোমার বাড়িতে।

মনির কিছু বলে না। এইসব ক্ষেত্রে ভদ্রতা করে হলেও আসবার কথা বলতে হয়। তার সে বালাইও নেই। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। কারণ ছাড়া মানুষ কিছু করে না। কারণটা জানতে ইচ্ছা করে।

খবির হোসেন দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন, সেই অবস্থায় এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন, এবং ঘুমের মধ্যে ভয়াবহ একটি দুঃস্বপ্ন দেখলেন। ঘামে তাঁর গা ভিজে গেল। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার মতো হল। কী ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। কী ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন।

৮. সুরা এখলাস পড়ে বুকে ফুঁ

খবির হোসেন সুরা এখলাস পড়ে বুকে ফুঁ দিলেন।

তাঁর স্বপ্নের ঘোর এখনো কাটে নি। বুক ধড়ফড় করছে। পানির পিপাসা হচ্ছে। অ্যালুমিনিয়ামের একটি জগে খাবার পানি থাকে। তাঁর কেন যেন মনে হল পানি নেই। আসলেই তাই, জগ শূন্য। তাঁর পিপাসা আরো বেড়ে গেল। তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এমন লাগছে কেন চারদিক? নাকি এখন তিনি স্বপ্ন দেখছেন? কেমন যেন থমথম করছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। অনেক উঁচুতে চক্রাকারে ছিল উড়ছে।

তিনি এ-অঞ্চলের মানুষ নন। এখানে দীর্ঘদিন ধরে আছেন, তবু এ-অঞ্চলের আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি ধরতে পারেন না। কিন্তু তাঁর মনে হল, সামনে দুঃসময়। একটি প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি সব শেষ করে দিতে পারে। একটি ভারি বর্ষণ মানেই শস্যশূন্য একটি দীর্ঘ বৎসর। স্বপ্নে কি এর ইঙ্গিতই ছিল? খবির হোসেন বিড়বিড় করে বললেন, ইয়া মাবুদ, ইয়া মালুদ, ইয়া রাহমানুর রহিম।

মনিরউদ্দিনের বাড়িতে কোনো পুরুষমানুষ কেন ছিল না, এখন তা বুঝতে পারছেন। ফসল কাটা শুরু হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, শস্য ঘরে তুলতে হবে। মানুষগুলির এখন কোনো বোধশক্তি নেই, এরা কাজ করছে যন্ত্রের মতো। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে তাকিয়েই আরো গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। ভয়াবহ সব

স্মৃতি আছে তাদের সেই সব নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাচ্ছে।

আছরের নামাজের সময় কি হয়ে গেল? মেঘে সূর্য ঢাকা পড়েছে। সময় বোঝর উপায় নেই। আজান দেবেন, নাকি অপেক্ষা করবেন আরো খানিকক্ষণ। তিনি মসজিদের বারান্দায় উবুহয়ে বসে রইলেন। ভাবতে লাগলেন স্বপ্নটার কথা। স্বপুটা এরকম তিনি যেন বাইরে কোথাও যাবেন। আচকান গায়ে দিয়ে জুতা পরবার জন্যে নিচু হয়েছেন, অমনি গলায় কি যেন ফাঁসের মতো আটকে গেল। প্রথমে হালকাভাবে, কিন্তু ক্রমেই তা শক্ত হয়ে এঁটে বসতে শুরু করল। তিনি হাত দিয়ে তা ছাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। জিনিসটি দারুণ পিছল। হঠাৎ তাঁর মনে হল এটা বোধহয় সাপ। আর তখনি সাপটি কানের কাছে ছোবল বসিয়ে দিল। তীব্র ব্যথায় জেগে উঠে তিনি বুঝলেন স্বপ্ন দেখছেন। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, কানের কাছের জায়গাটা এখনো ফুলে আছে, ব্যথা করছে। সম্ভবত কাঠপিপড়ের কামড়। স্বপ্নে ছোটখাটো জিনিস অনেক বড় হয়ে আসে।

খবির হসেন উঠে দাঁড়ালেন বাড়ি ফিরে যাবেন। পানি পিপাসায় এখন সত্যিসত্যি কাতর হয়েছেন। আছরের আজান দেওয়া হল না। দেওয়া ঠিক হবে না। অজু নেই। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। গাঢ় ঘুম হয়েছে। গাঢ় ঘুমে অজু নষ্ট হয়ে যায়।

পথ জনশূন্য। সব মাঠে চলে গিয়েছে। অথচ তিনি কিছুই জানেন না। এরা তাঁকে কিছুই বলে নি। এরা নিশ্চয়ই ভোরবেলাতেই টের পেয়েছে। মেঘ-বৃষ্টির ব্যাপারগুলি এরা খুব ভালো জানে। একবার বৈশাখ মাসে আকাশ অন্ধকার করে মেঘ এল, দেখেই মনে হচ্ছে পৃথিবী তোলপাড় হয়ে যাবে। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, অথচ গ্রামের মানুষ নির্বিকার। তারা হাসিমুখে বলেছে, এইটা হইল দেখন মেঘ। শক্ত বাতাস দিব। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ব। ব্যস।

আসলেই তাই। এরা আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু বলে ফেলে। প্রকৃতির উপর যাদের এত নির্ভর তাদের তো প্রকৃতিকে বুঝতেই হবে।

কিন্তু এরা কেউ তাঁকে কিছু বলল না কেন? তিনি কি এদেরই একজন না? এদের সুখ-দুঃখ কি তাঁর সুখ-দুঃখ নয়? অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, কোথাও কেউ তাঁকে আপন করে নেয় নি। দেশে-দেশে ঘুরে জীবন কাটল। যখন যেখানে ছিলেন, তাদের কথাই ভেবেছেন। আল্লাহপাকের কাছে খাস দিলে তাদের জন্যে মোনাজাত করেছেন। তাতে লাভ কী হয়েছে? কেন এই গ্রামের একটি লোক তাঁকে দৌড়ে এসে বলল না—মৌলানা সাব, আমরার বড় বিপদ, আপনে দোয়া-খায়ের করেন।

কিংবা মনিরের বৌটার কথাই ধরা যাক। এই রাতের বেলা একা-একা ছুটে গেছে। তাঁর কাছেও তো আসতে পারত। পারত না? হঠাৎ খবির হোসেনের মনে হল, তাঁর চোখে পানি এসে পড়েছে। তিনি বড় লজ্জা পেলেন। ভাগ্যিস দেখার কেউ নেই। তিনি খুব সাবধানে পাঞ্জাবির খুঁট দিয়ে চোখ মুছলেন। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবিতে সুরমার দাগ লেগে গেল। বাড়ি গিয়েই সাবান দিয়ে ধুতে হবে। ময়লা কাপড় তিনি পরতে পারেন না—দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। কাপড় ময়লা থাকলে মনটাও ময়লা হয়ে যায়। এই জন্যেই দিনের নবী রসূলুল্লাহ্ পরিস্কার কাপড় পরতেন, সুগন্ধি মাখতেন। খবির হোসেন গঞ্জ থেকে এক শিশি আতর কিনেছিলেন। গন্ধটা ভালোই, কিন্তু চামড়ায় লাগলেই জ্বালাপোড়া করে। কাপড়ে লাগলে বিশ্রী হলুদ রঙ ধরে। আতরের টাকাটা পানিতে পড়েছে।

খবির হোসেনের জন্যে একটা ছোটখাটো বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল। তাঁর একটা চিঠি এসেছে। এখানে চিঠি আসে পনের দিন পরপর। পিওন এতদূর আসে না, কোনো একটা

কোয়া নৌকার মাঝির হাতে ধরিয়ে দেয়। সেই মাঝি চিঠি নিজে দিয়ে যায় না। ঘাটে গ্রামের কাউকে পেলে তার হাতে তুলে দেয়। দু মাস তিন মাস আগের লেখা মলিন একটা খাম প্রাপকের কাছে ্কখনো পৌঁছায়, ্কখনো পৌঁছায় না।

দরজার কাছে পড়ে-থাকা খামটা তিনি গভীর মমতায় তুললেন। তাঁর ভাতিজির চিঠি। এই মেয়েটা তাঁকে চিঠি লিখবেই। এবং এমন সুন্দর করে লিখবে যে ইচ্ছা হবে সব ছেড়েছুঁড়ে মেয়েটার কাছে চলে যেতে। কত বার এরকম হয়েছে। দিনাজপুরের পঞ্চগড়ে থাকবার সময় এক বার এরকম হল। ব্যাগ, কাপড়চোপড় গুছিয়ে তিনি তৈরি-বাড়ি চলে যাবেন। শেষ পর্যন্ত যাওয়া হল না। যাওয়া না-যাওয়া তো মানুষের ইচ্ছার উপর না। আল্লাহপাকের ইচ্ছার উপর। যেদিন তাঁর হুকুম হবে, সেদিন যেতেই হবে।

তিনি চিঠি খুললেন। হাতের লেখা আগের মতো সুন্দর না। কেমন আঁকাবাঁকা। মেয়েটার শরীর ভালো তো? চিঠির শুরুতেই আছে-চাচাজী, আমার লক্ষ কুটি সালাম নিবেন। খবির হোসেন এই পর্যন্ত পড়েই চোখ বন্ধ করলেন, যেন সালাম নিচ্ছেন। এবং সত্যি-সত্যি শব্দ করে বললেন-ওয়ালাইকুম সালাম গো আম্মা। ওয়ালাইকুম সালাম।

আমি অন্তরে বড় দুঃখিত হইলাম চাচাজী যে আপনি অভাগীর পত্রের জবাব দেন। না। আমি তো কোনো দোষ করি নাই। যদি জানিয়া করিয়া থাকি আপনার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাই। চাচাজী আমাকে ক্ষমা দেন।

খবির হোসেনের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। এই মেয়েটা তাঁর বড় আদরের। চার বছর বয়স থেকে একে বড় করেছেন, পনের বছর বয়সে বিয়ে দিয়েছেন। খুব শখ করে বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়েতে মেয়েটার জীবনটানষ্ট। সুন্দর ছেলে, সুন্দর

চেহারা, কিন্তু স্বভাব-চরিত্র ইবলিশের মতো। মেয়েটার কষ্ট চোখে দেখা যায় না। দেশ ছাড়লেন তখন। কতকত যুগ আগের কথা। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

চাচাজী, আমার তো কেউ নাই। এক আপনি আছেন। সেই আপরেও কত দিন দেখি না। এখন দেখার জন্যে মন খুব পেরেশান হয়। শরীরও ভালো না। যদি কিছু হয়, যদি আর আপনার দেখা না পাই।

খবির হোসেনের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। ছিঃ ছিঃ, এ কী রকম খোদা-নারাজ কথা! হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে। এ নিয়ে কখনো কোনো কথা বলা উচিত না। কখনো না।

চাচাজী, আপনি শুনে খুব খুশি হবেন, আমার বড় মেয়ে আবু এইবার আই. এ. পাস করেছে। এখন বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হইতে চায়। আমার ইচ্ছা না। কিন্তু তার বাবার খুব শখ। চাচাজী, বড় খুশির কথা, আনুর বাবার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন সে আর আগের মতো না। বদঅভ্যাস কিছুই নাই। অবশ্যি নামাজ-কালাম করে না। কিন্তু জুমার নামাজে যায়।

খবির হোসেনের মন আনন্দে ভরে গেল। বড় খুশির কথা! বড়ই খুশির কথা। আলহামদুল্লিাহ্, আলহামদুল্লাহ।

আপনি যদি আমারে এখন দেখতে না আসেন তা হলে খোদার কিরা আমি আপনের জামাতারে নিয়া আপনারে নেওয়ার জন্যে ভাটি অঞ্চলে আসিব। সে অবশ্য পানির দেশে যাইতে ভয় পায়। কিন্তু উপায় কি? এইবার আপনাকে আর যাইতে দিব না। বাকি কয়টা দিন থাকতে হবে আমাদের সঙ্গে। নয়তো আপনার উপর আল্লাহর কিরা।

আহ, কী কথায়-কথায় আল্লাহর কি! কিছুই শিখল না। রাগ করতে গিয়েও তিনি করতে পারেন না। গভীর মমতায় তাঁর চোখ আর্দ্র হয়।

চাচাজী, আপনার পবিত্র পায়ে আবার শত কুটি সালাম।

তিনি চিঠি হাতে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। মনে-মনে বললেন-ওয়ালাইকুম সালাম মা বেটি। ওয়ালাইকুম সালাম।

চাচাজীগো, আপনার জন্যে আমি খুব কাঁদি। আপনার সেবাযত্ন করিবার ইচ্ছা হয়। মনটা পেরেশান হয় চাচাজী, মাঝে-মাঝে আপনেরে খোয়াবে দেখি। তখন বড় অস্থির লাগে। চাচাজীগো, আমার শরীর ভালো না। আপনেরে দেখতে মন চায়। আল্লাহ্পাক কি আমার আশা পূর্ণ করিবেন না?

মেয়েটার জন্যে খুব মন কাঁদতে লাগল। চলে গেলে কেমন হয়? অনেক দিন তো হল এখানে। জীবন প্রায় পার করে দিয়েছেন। শেষ কটা দিন না-হয় থাকলেন নিজের জায়গায়। মরবার আগে-আগে নাকি জন্মস্থানের মাটি ডাকতে থাকে। সেই ডাক অগ্রাহ্য করা মুশকিল। জন্ম-মাটির উপর শুয়ে থাকলে মৃত্যুর সময় আজাব কম হয়। বিদেশে মৃত্যু খুব কষ্ট।

তিনি অজুর বদনা নিয়ে বারান্দায় এলেন। চিলগুলি এখনো উড়ছে। তবে আগের মতো এত উপরে নয়। অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে। কালো রঙের আকাশে কেমন একটা তামাটে আভা।

৯. মনিরউদ্দিনের বাড়ির ভিড়

মনিরউদ্দিনের বাড়ির ভিড় পাতলা হয়ে গেছে।

বয়স্ক মানুষের মধ্যে আছে জলিল মিয়া। সে এসেছে কিছুক্ষণ আগে। বসে আছে মুখ গম্ভীর করে। পরপর দুটি বিড়ি খেয়ে তৃতীয়টি সে সবেমাত্র ধরিয়েছে। সে ক্রুদ্ধ চোখে তাকাচ্ছে নিবারণের দিকে। নিবারণ তার গায়ের ফতুয়া খুলে ফেলেছে। মাথায় পানিতে ভেজানো গামছা।

মনিরউদ্দিনকে ভেতরে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। সে ঘুমুচ্ছে, না অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে, বোঝা মুশকিল। শরিফা পাখা দিয়ে হাওয়া করছে। শরিফার চোখ টকটকে লাল। সে কাঁদছে না। তবে মাঝে-মাঝে হিকার মতো উঠছে।

চৌকির কাছে মতির মা বসে আছে। সে বসেছে পা ছড়িয়ে। যখন কিছু লোকজন হয়, তখনই সে সাড়াশব্দ করে কাঁদে। এখন লোকজন নেই বলে চুপচাপ আছে। কিছুক্ষণ আগে একটা পান মুখে দিয়েছে। মুখভর্তি পানের রস। সে বেশ আয়েশ করেই পান চিবুচ্ছে। প্রতি গ্রামেই আশ্রয়হীনা কিছু মেয়েমানুষ থাকে। বেঁচে থাকার তাগিদেই এদের স্বভাব হয় অতি মধুর। মানুষের বিপদে-আপদে এরা সারাক্ষণ সঙ্গে থাকে। বাড়ির মানুষদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাঁদে। তবু কেন জানি মনে হয় অন্যের বিপদে এরা এক ধরনের মানসিক শান্তি পায়। কোনো—এক বিচিত্র উপায়ে অন্যের দুঃসময় থেকে এরা আনন্দের উপকরণ সংগ্রহ করে। মতির মা এখন সম্ভবত তাই করছে।

সে উঠে দাঁড়াল এবং অস্বাভাবিক নরম গলায় বলল, পাংখাড়া আমার হাতে দেওগো বৌ। তুমি এট্টু জিরাও।

শরিফার পাখা দেওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মতির মা জোর করে পাখা নিয়ে নিল।

ওঝা হারামজাদা কোন কামের না। বিষ নামাইব কি, বিষ আরো উজাইছে। দেখ না, চেহারা কেন হইছে।

মতির মা বেশ শব্দ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

কেমুন কালা হইয়া গেছে শইলডা, দেখছ?

শরিফা কোন কথা বলল না। মতির মা গলা নিচু করে বলল, কপালের লিখুন। কপালের লিখন না হইলে কি আর......।

সে কথা শেষ করল না। কারণ মনিরউদ্দিন নড়ে উঠেছে। তার চোখ বন্ধ। নিঃশ্বাস ফেলেছে শব্দ করে।

বুঝলা বৌ, যেবছর অজন্মা গেল, হেই বছর ফরিদের বাপেরে সাপে কাটল। কী জোয়ান মানুষ। হাতির মত শইল। ওঝা আইল তিন জন গরু মানত করল তার বৌ। লাভ হইল না। সকালে কাটছে, দুপুরের মইধ্যে কাম শেষ। ওঝারা কইল, কলার ভোরাত কইরা মড়া ভাসাইয়া দেও। তার বৌ রাজি না। সে কবর দিতে চায়। তা, মাইয়ামাইনষের কথার দাম কী? মাইয়ামাইনষের কথার দাম হইল এক পয়সা। গ্রামের দশ জনে মিইল্যা কলাগাছের

ভোরা বানাইল। নিশান লাগাইল। সাত দিনের খোরাকি দিয়া ভাসাইয়া দিল। তারপরে কী হইল, শুনবা?

শরিফার শোনার কোনো ইচ্ছা নেই। কিন্তু সে হ্যাঁ-না কিছুই বলল না।

হেই কলার ভোরা গিয়া লাগল দুই মাইল দূরের নিশাপুরে। শিয়াল-কুত্তায় লাস কামড়াইয়া খাইয়া ফেলল। একটা হাত শিয়ালে কামড় দিয়া লইয়া আইল এই গেরামে। বুঝলা বৌ, একটা কথা কই হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে। যদি কিছু হয়, কলার ভোরাত তোমার সোয়মীরে তুলবা না। কোন লাভ হয় না। এককালে হইত, যখন বেউলার মতো সতী নারী ছিল। অখন কি বেউলার মতো সতী নারী পাইবা? না, পাইবা না। ত্রিভুবনে নাই। ও বৌ, দানাপানি চাইর মুখে দেও। আহা রে, মাইয়ার মুখটা শুকাইয়া কী হইছে।

মতির মার হাত এক মুহূর্তের জন্যেও থামছে না। পাখা নড়ছে। এই অবস্থায় ঘন্টার পর ঘন্টা পাখা নেড়ে যেতে পারবে। দেখে মনে হবে না, ক্লান্তি তাকে স্পর্শ করেছে। মাটির গামলায় পানি। মাঝে-মাঝে মতির মা পানিতে গামছা ভিজিয়ে মনিরউদ্দিনের কপাল মুছে দিচ্ছে।

ও বৌ, আসমানের অবস্থা দেখছ? কপাল তোমার একলার পুড়ছে না। গেরামের কপাল পুড়ছে। দুই আনি ধানও তুলা যাইত না। সব শেষ। ভিক্ষা করুন লাগব গ্রামচুক্তি। দেহি, আরেকটা পান দেও।

শরিফা পান এনে দিল। ঠিক তখন মনিরউদ্দিন ক্ষীণ স্বরে বলল, ভিজা গামছা শইলে ছোঁয়াইবা না। খবরদার, শীত লাগে।

শরিফা এবং মতির মা দু জনকেই চমকে দিল। বেশ শক্ত সবল মানুষের কথা। মতির মা বলল, শইল কেমুন বাজান?

শইল আছে শইলের মতো। মাথার কাছে বইস্যা ভ্যাজভ্যাজ করবা না। শরিফা কই?

শরিফা এগিয়ে এল।

কিছু খাইতে দে। খিদা লাগছে। ভাত আছে?

শরিফা রান্নাঘরে ছুটে গেল। সাপে-কাটা বাড়িতে উনুন ধরানোর নিয়ম নেই। কিন্তু মানুষটা ভাত খেতে চেয়েছে। চারটা গরম ভাত, একটা ডিম ভাজা, সেই সঙ্গে গোটা দুই পোড়া শুকনো মরিচ। কতক্ষণ আর লাগবে?

মতির মা শরিফার পেছনে-পেছনে রান্নাঘরে এসে উপস্থিত হল। চোখ কপালে তুলে বলল, চুলা ধরাইতাছ, কী সর্বনাশ।

ভাত খাইতে চায়।

অন্য বাড়িত থাইক্যা আইন্যা দিমু। চুলা ধরাইবা, এইটা কেমুন কথা! দেখি, বর্তন দেও।

মতির মা থালা নিয়ে বেরিয়ে গেল। তাকে অনেকখানি পথ যেতে হবে। মনিরউদ্দিনের বাড়িটি একেবারে এক পাশে। কার বাড়িতে যাবে, সেও এক সমস্যা। অসময়ে খাবারদাবার পাওয়া যাবে এমন বাড়ির সংখ্যা এখানে বেশি নয়। মতির মা ঠিক করল, সে যাবে নিয়ামত

খাঁর বাড়ি। খাওয়াদাওয়া ভালো। মনিরউদ্দিনের এটাই হয়তো শেষ খাওয়া। ভালোমতো খাক।

নিবারণ বলল, আমারে একটা বিড়ি দ্যান।

জলিল মিয়া না-শোনার ভান করল। নিবারণ দ্বিতীয় বার বলল, একটা বিড়ি দ্যান।

সে আগে জলিলকে তুমি করে বলেছে, এখন আপনি করে বলছে। জলিলের খুশি হওয়ার কথা। খুশি হওয়ার বদলে রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছে। এই লোককে বহু হাঙ্গামা করে আনা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় নি। খানিকক্ষণ হামহাম করে নিজেই বমিটমি করে ভাসিয়েছে। এখন আবার বিড়ি চায়। জলিল বলল, বিড়ি নাই।

হাতেরডা দ্যান।

জলিল বিড়ির টুকরাটা ছুঁড়ে দিল। এমনভাবে দিল যেন নিবারণকে উঠে গিয়ে আনতে হয়। নিবারণ তাই করল। জলিল বলল, অখন করবেন কী আপনে?

করনের কিছু নাই। কালনাগের বিষ।

কালনাগের না হইয়া অন্য সাপের হইলে, পারতেন?

নিবারণ জবাব দিল না। জলিল কড়া গলায় বলল, শিং মাছের বিষ নামানির ক্ষ্যামতাও আপনের নাই।

এইটা কেন কথা কন?

যে সত্যি, হেইডা কই।

আমি নিজ থাইক্যা তো বাবাজি আসি নাই। তুমি গিয়া আমারে আনছ।

বেকুবি করছি।

বাজান, অখন আমার বাড়িত যাওন দরকার। শইলটা যুত নাই। খুব বেযুত।

রুগী মরে-মরে, আপনের বাড়িত যাওনের চিন্তা।

বইয়া থাইক্যা লাভ নাই।

বইয়া থাকতে আপনেরে কয় কে? মন্ত্রট পড়েন। কড়ি চালান দেন। কড়ি চালান জানেন?

নিবারণ লাল চোখে তাকিয়ে রইল। ছেলেটা তাকে অপমান করার চেষ্টা করছে। এটা নতুন কিছু না। অতীতে তার জীবনে অনেকবার ঘটেছে। হয়তো রুগীর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মন্ত্রতন্ত্র পড়া শুরু করার কিছুক্ষণ পরই রুগীর চোখ উল্টে গেছে। রুগীর আত্মীয়স্বজন চড়াও হয়েছে তার উপর যেন মৃত্যুর দায়ভাগ তার। যেন সে সাপকে শিখিয়ে দিয়েছে একে কাটবার জন্যে।

এখানেও তাই হবে। আগের ভক্তি-শ্রদ্ধা মানুষের মনে নাই। মানিগণ্যিও নাই। বিশ্বাসের বড় অভাব। বিশ্বাস ছাড়া এই দুনিয়ার কিছু হয় না। নিবারণ উদাস গলায় বলল, জলিল ভাই, আমারে দিয়া আসনের ব্যবস্থা করেন। শইলডা খারাপ।

কী যে পাগলের কথা ক! দিনের অবস্থা দেখেন। কে দিয়া আইব?

যে আমারে আনছে, হে।

আমার খেতে যাওন লাগব। এই যে আইয়া বইলাম, না-পাইরা বইলাম। দোস্ত মানুষ মইরা যাইতাছে।

তয়, আমি যাই ক্যামনে?

জলিল তার জবাব না-দিয়ে উঠে গেল। অনেকখানি সময় সে এখানে কাটিয়েছে। উচিত হয় নি। সে বসে থাকায় মনিরের কোন লাভ হয় নি।

নিবারণ তাকিয়ে দেখল, জলিল হনহন করে যাচ্ছে। এক বার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছে না। বিশ্বাস মানুষের মন থেকে উঠে গেছে। মানুষের মনে ভক্তি নাই, শ্রদ্ধা নাই, কিছুই নাই। মানুষগুলি এমন হয়ে যাচ্ছে কেন? নিবারণ তলপেটে ব্যথা অনুভব করল। প্রচণ্ড খিদে লেগেছে। খিদে লাগলেই পেটে ব্যথা হয়। বমি-বমি ভাব হয়। দিন বোধহয় শেষ। সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। গা থেকে খুলে-ফেলা ফতুয়াটি ভাঁজ করে কাঁধে রাখল। খাওয়ার

জোগাড়ের ব্যবস্থা দেখা দরকার। সাপে-কাটা বাড়িতে রান্না হয় না, কিন্তু অন্য বাড়ি থেকে খাওয়া আসতে দোষ নাই। সেই দিকে কারো নজর নাই। তার দিকে কে নজর দেবে?

নিবরণ উঁচু গলায় বলল, মা লক্ষ্মী, একটু জল দেও।

শরিফা বের হয়ে এল। হাতে অ্যালুমিনিয়ামের একটা জগ। নিবারণ নিচু গলায় বলল, বাড়ির ভিতরে গিয়া কন, আমি বিদায় নিছি। বহু দূরের পথ।

শরিফা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, যাইবেন ক্যান? কিছু করনের নাই। কালনাগের দংশন।

শরিফা শীতল গলায় বলল, রুগী ভালো আছে। আপনে যাইয়েন না, থাকেন। ভালো কইরা ঝাড়েন।

নিবারণ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বলে কী এই মেয়ে! রুগী নাকি ভালো আছে। এতক্ষণে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা।

কী কইলা?

রুগী ভালো আছে। ভিতরে আইস্যা দেখেন।

কও কী তুমি!

খাওয়াদাওয়া করেন। ভালো কইরা ঝাড়েন।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

তুমি রুগীর কে হও? পরিবার?

শরিফা মাথা নাড়ল।

যে-ঝাড়া দিছি, এর উপরে ঝাড়া নাই। কি করবা কও? মাইনষের বিশ্বাস নাই। বুঝলা, এই নিবারণের ঝাড়ার কারণে তিন দিনের মড়া হাঁইট্টা বাড়ি গেছে। আমার ওস্তাদ ছিল......পাপমুখে তার নাম নেওন যায় না। কিন্তু মা, এই ওস্তাদের নামে দোহাই দিলে অখনও বিষ আটকায়া যায়।

দেন, আপনে ওস্তাদের নামে দোহাই দেন।

পাপমুখে তার নাম নেওন যায় না মা লক্ষ্মী। আমি পাপী মানুষ।

না, আপনের উপরে আল্লাহ্‌র কিরা লাগে।

শরিফা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। নিবারণের মনটা খারাপ হয়ে গেল। আহা রে, বাচ্চা মেয়ে, কী কষ্টের মধ্যে পড়ছে। সে উদাস গলায় বলল, কাইলো না, ব্যবস্থা করছি। চিন্তার কিছু নাই। কালা গাইয়ের দুধ আরেক বাটির জোগাড় দেখ। বিষের গতিকটা দেখি।

অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে নিবারণ মুখে পানি ছিটাতে লাগল। শরিফা বলল, রুগীর সঙ্গে কথা কইবেন?

কথা? কথা কওনের অবসর নাই। মেলা কাম বাকি।

নিবারণ লাল গামছা মাথায় জড়িয়ে দিল। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। ক্লান্তির ছিটেফোঁটাও এখন তার মধ্যে নেই। উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল। আশেপাশে লোজন বিশেষ নেই। কয়েকটা ছেলে-ছোকরা। তাতে কিছুই যায়-আসে না। চড়কির মতো সে তার ডান হাত ঘোরাতে শুরু করল–

ও বিষ বিষ রে
কালনাগের বিষ রে।
শীশ নাগের ইস রে
মা মনসার রীশ রে–
এর বাড়িতে আইস না,
আসমান জমিন চাইস না
তোর পায়ে ধইরা সতী বেহুলা কান্দে রে।

১০. এতগুলি মানুষ মাঠে কাজ করছে

এতগুলি মানুষ মাঠে কাজ করছে, এটা বোঝর কোনো উপায় নেই। কারো মুখে কোনো কথা নেই। ধান কাটার ব্যাপারটায় অনেকখানি আনন্দ আছে। ধানের গোছা স্পর্শ করায় আনন্দ, তার ঘ্রাণে আনন্দ। এই সময়টায় শিশুরা সারা মাঠে ছোটাছুটি করে। বাবারা কপট রাগের ভঙ্গিতে ধমক দেয়-দামালি করি না। শিশুরাও টের পায় এটা কপট রাগ। তারা আরো হৈচৈ করে।

কিন্তু আজকের পরিবেশ ভিন্ন। এক দল ধান কাটছে, অন্য দল কাটা ধান অতি দ্রুত ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। কোনোদিকে তাকানোর অবসর নেই। তবু এরা মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। যত বার তাকাচ্ছে ততবারই তাদের মুখে শঙ্কার ছায়া গাঢ়তর হচ্ছে।

মাঠ রক্ষার জন্যে এক জন ফিরাইল আছেন। লম্বা কালো রঙের পাঞ্জাবি গায়ে ফিরাইলের চেহারা হয়েছে ছাইবর্ণ। তাঁর বিদ্যার পরীক্ষা হবে আজ। আসন্ন ভয়াবহ দুর্যোগ থেকে মাঠকে তিনি কি রক্ষা করতে পারবেন? গত দু মাস ধরেই মাঠে তিনি বাস করছেন। ছোট্ট একটা টং বানিয়ে দেওয়া হয়েছে মাঠের মাঝখানে। খাওয়াদাওয়া, ঘুমুনো–সবই এইখানে। গত দু মাস এই মাঠের শস্য তিনি রক্ষা করেছেন। শেষ মুহূর্তে তিনি কি পারবেন?

ফিরাইল সাব, গতিক কেমন বুঝেন?

ফিরাইল জবাব দেন না। তাঁর হাতে পাকা বাঁশের দু হাত লম্বা লাঠিটি ক্রমাগত ঘরে। বিড়বিড় করে তিনি ক্রমাগত কী-সব পড়েন। লাঠির সঙ্গে-সঙ্গে তিনি নিজেও ঘোরেন।

ফিরাইল সাব, উত্তর দিক দিয়া বাতাস ছাড়ছে। উত্তর-পশ্চিম কোণা। টের পান?

ফিরাইল মাথা নাড়েন। তিনি জানেন, তিনি সব জানেন। তিনি লক্ষ রাখছেন। যা করবার তিনি করবেন। এক জায়গায় তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন না। কিছুক্ষণ পরপর জায়গা বদল করছেন। তাই নিয়ম। তবে একটা সময় আসবে, যখন তিনি আর জায়গা বদল করবেন না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আকাশ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবেন। সেরকম ক্ষমতাবান ফিরাইল হলে তিনি দুর্যোগ টেনে নেবেন নিজের শরীরে।

কত হয়েছে এরকম। খুব বেশি দিনের কথাও নয়। বছর দশেক আগে ঠিক এরকম অবস্থা হল। মাঝরাতে হঠাৎ আকাশ কালো করে বজের শব্দ হতে লাগল। বিকট শব্দ নয়। খুব ধীর শব্দ। শিলাবৃষ্টির আলামত। বৈশাখের মাত্র শুরু। ধান সবে পাকতে শুরু করেছে। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ দলে-দলে বের হয়ে এল। তারা দেখল, ফিরাইল সাহেব তাঁর লম্বা বাঁশের লাঠি নিয়ে সমস্ত মাঠ জুড়ে উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করছেন। মাঝেমাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছেন। সেই হুঙ্কার ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে। তিনি হুঙ্কার দেন, সঙ্গে-সঙ্গে আকাশ হুঙ্কার দিয়ে তার জবাব দেয়। যেন আকাশ এবং মানুষের যুদ্ধ। এক সময় আকাশের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। ফিরাইল দুই হাত উঁচু করে ধরলেন। পৃথিবী কাঁপিয়ে বজ্রপাত হল। ফিরাইল লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করলেন শস্যের মাঠ।

আজকের ইনি কি তা পারবেন? এঁর চেহারা ছেলেমানুষের মতো। গলার স্বর মেয়েদের মতো চিকন। কথা বলেন মধুর স্বরে। ফিরাইলদের সেই কঠোরতা এর মধ্যে নেই। তবু এই লোকও খুব নামী লোক। অতীতে বহু মাঠ রক্ষা করেছেন। হয়তো এটাও করবেন।

বজলু সরকার সেই দুপুর থেকেই মাঠে আছেন। দাঁড়িয়ে আছেন এক জায়গাতেই। যেখানে আছেন, তার চারপাশের অনেকখানি জমিই তাঁর। কলক করছে পাকা ধান। কী পুরুষ্টু গোছা! বজলু সরকার আফসোসের একটি শব্দ করলেন।

তিরিশ জন লোক একসঙ্গে তাঁর জমিতে ধান কাটছে। দশ জন বাইরের উজান দেশের। উজান অঞ্চলের লোকেরা পুরুন্টু ধানের গোছা ঠিকমতো ধরার কায়দা পর্যন্ত জানে না। তা ছাড়া কাজেও মন নেই। একটু পরপর বলছে-কই, তামুক দেখি। এক জন আবার মহা বাবু, সে সিগ্রেটের প্যাকেট নিয়ে এসেছে। আয়েশ করে সিগ্রেট টানছে। কিছু দূর টানা হলে বন্ধুকে দিচ্ছে। নিচু গলায় হাসি-মশকরা করছে। আশ্চর্য, এই সময়ে করো হাসি আসে? এটা হাসির সময়? কী সর্বনাশ হতে যাচ্ছে, তা কি এই বেকুবগুলি বুঝতে পারছে না?

বজলু সরকার উঁচু গলায় ডাকলেন, জলিল, জলিল।

জলিল কাস্তে হাতে উঠে এল। বজলু সরকার কোমল গলায় বললেন বও এট্ট। এইখানে বও।

জলিল বিস্মিত স্বরে বলল, এইটা বওনের সময়? কি কইবেন তাড়াতাড়ি কন।

বইতে কইছি, বও।

জলিল বসল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। বজলু সরকার প্রশংসার চোখে তাকিয়ে আছেন। এরকম দশটা মানুষ থাকলে ফসল কেটে ঘরে তোলা যায়। এরা মানুষ নয়, যন্ত্র।

মনিরের খবর কি?

কোনো খবর নাই।

কেমন দেখলা?

বালা না। অবস্থা খারাপ।

এই সময়টার মইধ্যে মনির থাকলে......

বজলু সরকার কথা শেষ করলেন না। জলিল বলল, আর কিছু জিগাইবেন?

ওঝা কী কয়?

আরে, ঐ ব্যাটা বলদ, জানে না কিছু।

পুরানা কালের ওঝা কই পাইবা কও? পুরানা দিন নাই, বুঝলা। পুরানা মানুষও শেষ, দিনও শেষ।

জলিল উসখুস করতে লাগল। দাঁড়িয়ে বকবক করার সময় এটা না। এই মানুষ এই সহজ জিনিসটা বুঝতে পারছে না। চিন্তা-ভাবনায় হয়তো মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে।

জলিল মিয়া।

জ্বি।

এইখানের যে ফিরাইল দেখতাছ, হেও নিকামা। এক ফোঁটা বিষ্টি ফিরানির ক্ষ্যামতা নাই। মুখের মইধ্যে দুধের গন্ধ–চেংড়া পোলা।

জলিল বলল, যাই, কাম করি গিয়া। বেহুদা দিরং হইতাছে।

তুমি একটা কাম কর–যাও, মনিরের বাড়িত যাও গিয়া। একজন-কেউ থান দরকার।

জলিল বিস্মিত হয়ে তাকাল।

আমি যাইতাম, কিন্তু নড়তাম পারছি না। যাও, তুমি যাও।

যাইয়া লাভটা কি?

মনিররে ডাক্তারের কাছে নেও।

ডাক্তার-কবিরাজ এর কী করব?

না করুক, তবু নেও। মনের শান্তি।

জলিল জবাব না-দিয়ে কাস্তে হাতে নিঃশব্দে তার জায়গায় ফিরে গেল। এ অঞ্চলের একমাত্র পাশ-করা ডাক্তার থাকেন নান্দিপুরে। এখান থেকে কম করে হলেও কুড়ি মাইল।

নদীতে পানি নেই। গরুর গাড়ির ব্যবস্থা দেখতে হবে। সেও এগ্রামে নেই। সবচেয়ে বড় কথা, দিনের এই অবস্থা।

জলিল মিয়া।

জ্বি।

কি কইলাম এতক্ষণ? যাও, মনিরের বাড়িত যাও।

লাভ নাই কিছু।

লাভ-লোকসান দেখনের কাম নাই। তোমারে যা কইলাম, কর।

বজলু সরকার মুখে বললেন, লাভ-লোকসান নিয়ে তিনি বিচলিত নন, কিন্তু আসল ঘটনা তা নয়। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে ছোট্ট একটা খেলা খেললেন। ঈশ্বরকে প্রবঞ্চনা করতে চাইলেন। তাঁর মনে হল, নিজের ক্ষতির ভয় থাকা সত্ত্বেও তিনি মনিরের জন্যে লোক পাঠাচ্ছেন। এতে আল্লাহ্ খুশি হবেন এবং কোন অলৌকিক উপায়ে তাঁর শস্যের খেত রক্ষা পাবে।

আকাশে গুড়ুগুড়ু মেঘ ডাকতে শুরু করেছে। মেঘের পরে মেঘ জমছে, অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, বৃষ্টির ফোঁটাও এখনো পড়ে নি।

তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে ফিরাইলের দিকে তাকালেন। হাত তুলে অদ্ভুত সব অঙ্গভঙ্গি করছে লোকটা। রাগে গা জ্বলে যায়। এই চেংড়াকে আনাই ভুল হয়েছে। এসব কি চেংড়া-ফেংড়ার কাজ।

উজানের কামলাদের একজন কিসে যেন খুব মজা পেয়েছে, হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। অন্যরা ধান কটা বন্ধ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বজলু সরকার এগিয়ে গেলেন। কামলাটি হাসিমুখে বলল, সরকার সাব, কুদ্দুসের কথা হুনছেন। কুদ্দুস কয় কি......

বজলু সরকার তাকে কথা শেষ করতে দিলেন না। প্রচণ্ড একটি লাথি বসিয়ে দিলেন। লোকটি ধানখেতে গড়িয়ে পড়ল। সরকার সাহেব নিজের জায়গায় ফিরে এলেন।

হতভম্ব কামলাটি উঠে বসেছে। সে সঙ্গীদের দিকে তাকাচ্ছে সমর্থনের আশায়। কিন্তু সঙ্গীরা আবার কাজ শুরু করেছে, যেন কিছুই হয় নি।

নিয়ামত খাঁ মাঠে আসেন নি। এ ছাড়া আর সবাই আছে। খাঁ সাহেব কেন আসেন নি বোঝা যাচ্ছে না। শরীর খারাপ বোধহয়। তাঁর দিন শেষ হয়ে আসছে। ছেলে নেই, দুটিমাত্র মেয়ে। মেয়ের জামাইরা এখনই কোন্দল শুরু করেছে। জমির ভাগাভাগি কী হবে, এ নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা। জামাই দুটিই হচ্ছে মহা হারামজাদা। বজলু সরকার এক জনকে লক্ষ করলেন। বেশ প্যান্ট-শার্ট গায়ে দিয়ে এসেছে। চোখে কালো চশমা। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট ছিল, বজলু সরকারকে দেখে ফেলে দিয়ে সে এগিয়ে এল এবং শুদ্ধ বাংলায় বলল, চাচাজীর শরীরটা ভালো তো?

শরীর ভালই। তোমার শরীর কেন?

আছি কোনোমতে।

এইখানে আইছ কি জইন্যে? রঙ্গ-তামশা দেখতে?

জ্বি, কি বললেন?

এইটা রঙ্গ-তামশা দেখনের সময় না। তুমি গেরামের জামাই। যদি জামাই না হইতো, তা হইলে তোমারে ধান কাটতে লাগাইয়া দিতাম।

জামাই হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রাইল। নিয়ামত খাঁর জামাইকে এত বড় কথা বলাটা ঠিক হয় নি, কিন্তু বজলু সরকার বেশ ভেবেচিন্তেই বলেছেন। এই বিদেশি ছেলেটির সঙ্গে তিনি একটি বিরোধ তৈরি করতে চান। তিনি চান না, এখানেই সে স্থায়ী হোক। বাইরের লোকজন এখানে আস্তানা গাড়ুক, তা তিনি চান না। এ ছাড়া এই শার্ট-প্যান্ট-পরা যুবকটির সঙ্গে কঠিন ব্যবহার করায় একটু আগে তিনি লাথি বসিয়ে যে-অন্যায়টি করেছিলেন, তা খানিকটা কমবে। যে খেয়েছে, সে বুঝবে, এই লোকটি কাউকে রেয়াত করে না। তাঁর স্বভাবই এমন। বজলু সরকার সব কাজই খুব ভেবেচিন্তে করেন। বড় হতে হলে ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয়। তিনি সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টা এবং নিজের বুদ্ধিতে বিশাল সম্পত্তি করেছেন। জলমহাল করেছেন। এইসব এমনি-এমনি হয় না। সম্পত্তি করা খুব কঠিন নয়। বজায় রাখাটাই কঠিন।

বজলু সরকার লক্ষ করলেন, নিয়ামত খাঁর জামাই মুখ কালো করে চলে যাচ্ছে। যাক, আপদ বিদায় হোক। তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর মনে একটি গভীর ক্ষত

আছে। বিপুল বিষয়-সম্পত্তি করেছেন ঠিকই, কিন্তু কোনো পুত্র-কন্যার মুখ দেখতে পারেন নি। তাঁর তিন স্ত্রীর প্রতিটিই অপদার্থ। আরেক বার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু কেন জানি আর কোনো আগ্রহ বোধ করেন না। রক্তের তেজ মরে গেছে।

বজলু সরকার লক্ষ করলেন, ফিরাইল তাঁর দিকে দ্রুত আসছে। কি বলতে চায় কে জানে? তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। এদের মুখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি কথা বলতে ভালো লাগে না।

সরকার সাব।

বলেন।

একটা কথা বলতে চাই আপনেরে।

বলেন। কি কথা?

কথাটা এট্টু আড়ালে করতে চাই।

যা কওয়ার এইখানেই কম। কানাকানি আমি পছন্দ করি না। কানাকানি করে। মেয়েলোকে।

ফিরাইল ইতস্তত করছেন। কথাটা যেন বলতে পারছেন না, আবার না-বলেও পারছেন না।

কি, বলেন আপনের কথা।

আপনে বাড়িত গেলে ভালো হয়। বাড়িত যান গিয়া।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

দিনের অবস্থা খুব খারাপ। আপনে থাকলে অসুবিধা হইব।

কি অসুবিধা।

যারার পুত্রসন্তান নাই, তারা মাঠে থাকলে আমার অসুবিধা। আমি ফিরাইতে পারতেছি না। সবকিছুর একটা নিয়ম আছে সরকার সাব। অপরাধ নিবেন না। আপনে বাড়িত যান।

আমি চইলা গেলে তুমি ফিরাইতে পারবা?

চেষ্টা করমু। অখন চেষ্টাও করতে পারতেছি না।

কামলারা ধান কটা বন্ধ করে অবাক হয়ে ফিরাইলের কথা শুনছে। বজলু সরকার প্রথম বারের মতো তীক্ষ চোখে লোকটিকে দেখলেন। একে শুরুতে দুধের বাচ্চা বলে মনে হয়েছিল, এখন হচ্ছেনা। এ বোধহয় পারবে। বজলু সরকার হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁর পা মনে হচ্ছে পাথরের মত। টেনে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে।

আকাশে বজের শব্দ। হালকা বাতাস ছাড়তে শুরু করেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বজলু সরকার এক বারও পেছনে ফিরে তাকালেন না।

১১. মতির মা খাবার নিয়ে এসেছে

মতির মা খাবার নিয়ে এসেছে।

এক গামলা ভাত, রুই মাছের তিনটা বড়-বড় দাগ। এক বাটি মাষকলাইয়ের ডাল। মনিরউদ্দিন তার কিছুই মুখে দেয় নি। দু-এক নলা মুখে দিয়ে থালা সরিয়ে দিয়েছে। শরিফা বলল, কি হইছে? খান না?

মুখে দেওন যায় না। তরকারিত লবণ দিছে দুই হাতে।

একটা ডিম ভাইজ্যা দেই?

না, খিদা নাই।

দেই, একটা ডিম দেই।

মনিরউদ্দিন কাল শরিফার দিকে। তার মুখ এতটুকু হয়ে গেছে। এমনভাবে ডিম ভেজে আনার কথা বলছে যে, মনিরউদ্দিন না বললে সে কেঁদে ফেলবে।

শরিফা আবার বলল, লবণ ছাড়া ভাইজ্যা দেই?

আচ্ছা দে।

সেই ডিমও মনিরউদ্দিন খেতে পারল না। মতির মা ভাত-তরকারি দিয়ে এল নিবারণকে। নিবারণ এমনভাবে খাচ্ছে, যেন সে দীর্ঘদিনের উপবাসী। মতির মা লম্বা ঘোমটা টেনে পাশে বসে আছে। নিবারণ বলল, তরকারি ভালো হইছে। পুষ্কুনির রুই মাছ-এর বোয়াদই আলাদা। নদীর রুই মাছ অত স্বা়োদ হয় না। নাম কি তোমার?

মতির মা নাম বলল না

বসল। তার নিজের নামের কি কোন খোঁজ আছে? তাদের মতো মানুষদের নিজের নাম থাকে না। ভাগ্যিস মতি বলে একটা মেয়ে ছিল। লোকজন সেই মেয়ের নামে তাকে ডাকে। মরা মেয়েটার কথা বারবার মনে করিয়ে দেয়।

কোন বাড়ি তোমার?

বাড়িঘর নাই।

পান আছে? চুন বেশি কইরা দিয়া একটা পান খাওয়াও গো ভালো মাইনষের ঝি।

মতির মা পান আনতে গেল। লোকটার সঙ্গে বসে গল্প করতে ভালো লাগছে। এই লোকটির সঙ্গে তার মৃত স্বামীর কোথায় যেন একটা মিল আছে। ঐ মানুষটাও বড়বড় নলা করে ভাত মাখত। এমনিতে কথাটথা বলত না, কিন্তু একটু ভালো খাওয়াখাদ্য হলেই শুরু হয়ে যেত বকবকানি। তার গল্প মানেই খাওয়ার গল্প। মাশুল মাছ খেয়েছিল নাকি কোথায়, তার স্বাদের কোন তুলনা নেই। চোখ বড়-বড় করে বলেছে—দুনিয়ার মইধ্যে মাছ বলতে একটা মাশুল মাছ। হাড়েগুড়ে মিডা।

মিডা? মিছা মাছের আবার স্বোয়াদ কি?

না খাইলে বুঝবি না।

আন একদিন, খাইয়া দেখি।

দেখি, যদি পাই।

খাওয়া-খাদ্যের গলে ঐ লোটার কোনো ক্লান্তি ছিল না। মতির মা একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে পান নিয়ে বের হয় এল। বাঁশের দরজায় হেলান দিয়ে নিবারণ ঘুমুচ্ছে। গাঢ় ঘুম। নিবারণের মুখ হাঁ হয়ে আছে। লাল টুকটুক জিভ অল্প-অল্প নড়ছে। মতির মা তাকে ডাকল না। পানের বাটা সামনে রেখে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তাকে যেতে হবে নিয়ামত খাঁর বাড়ি। অনেক কাজ সেখানে। ধান সেদ্ধ হচ্ছে। সেদ্ধ ধান ঘরে নেওয়া হচ্ছে। কাজের মেয়ে অনেক আছে। আরো দরকার। নিয়ামত শার বড় তরফের বৌ তাকে হাত ধরে বলেছে-দির করিস না। ভাতের গামলা থুইয়াই দৌড় দিয়া আসবি। মতির মার যেতে ইচ্ছা করছে না। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো ব্যাপার তার জীবনে দীর্ঘদিন ধরেই নেই। তাকে যেতেই হবে। শরিফা মেয়েটা একা-একা থাকবে। এমন দুঃসময়ে কাউকে একা থাকতে দেওয়া ঠিক না। কিন্তু এই সংসারে ঠিক কাজটা কখনো হয় না। বেঠিক কাজই সব সময় হতে দেখা যায়। জগৎ-সংসারের এইটাই নিয়ম। মতির মার চোখে হঠাৎ পানি এসে গেল। পানি আসার কোনোই কারণ নেই। কেন এরকম হল কে জানে।

সে আর ঘরে ঢুকল না—সেখান থেকেই ক্লান্ত গলায় বলল, ও শরিফা, আমি গেলাম। সইন্ধার পর আসমু।

মতির মা উঠোনে নেমেই টের পেল, বাতাস দিচ্ছে। বেশ ভালো বাতাস। এই বাতাস কি মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাবে? মতির মা আকাশের দিকে তাকাল।

শরিফা ঘরে একটা কুপি জ্বালিয়েছে। সন্ধ্যা মেলানোর আগে কুপি ধরানো অলক্ষণ। এখন যেমন অন্ধকার করেছে, কুপি জ্বালানোয় নিশ্চয়ই দোষ হবে না। মনিরউদ্দিন বালিশে ঠেস দিয়ে কুপির আলোর দিকে তাকিয়ে আছে। শরিফা বসে আছে কুপির সামনে। মনিরউদ্দিন লক্ষ করল, শরিফার নাকে সবুজ রঙের পাথর-বসানো একটা নাকফুল। গাইনবেটিদের কাছ থেকে কিনেছে বোধহয়। গাইনবেটিরা ফসল তোলার আগেই ডালা সাজিয়ে একবার আসে। পান-খাওয়া লাল দাঁত বের করে বলে কিনেন। গগা ভইন। বালা সদাই। দামের চিন্তা নাই। ধান উঠুক।

গ্রামের বোকাসোকা মেয়েগুলি স্বামীকে লুকিয়ে জিনিসপত্র কিনে ঘর বোঝই করে। তরল আলতা, ফিতা, রাং, কাঁচের চুড়ি, পাউডার, কাজল, লক্ষ্মীবিলাস তেল, স্বামী-সোহাগী সাবান। জিনিস কেনার ব্যাপারে শরিফার হাত খুব দরাজ। যাই দেখবে কিনে ফেলবে।

গত বার কিনেছে পেলেন চিলুমচি। সেখানে তার নিজের নাম লেখা। ফুল লতাপাতা আঁকা। এক কাঠা চাল দিতে হয়েছে চিলুমচির জন্যে। এসব জিনিস দেখেও না-দেখার ভান করতে

হয়। মেয়েজাতের নিয়মই হচ্ছে অবিবেচকের মতো কাজ করা। তবু মাঝেমধ্যে নিয়মরক্ষার জন্যে দু-একটা কড়া কথা বলতে হয় বলেই মনির বলল, খামাখা চিলুমচি কিনলা ক্যান?

শরিফা এঁকেবেঁকে বলল, আমার নাম লেখা আছে। আমার সামনে লেখছে।

কই, দেখি!

শরিফা আগ্রহ করে দেখাল।

সত্যি-সত্যি কী-সব যেন লেখা। নামই হবে।

বাজে-খরচ মোটেই করবানা, বুঝলা। এই বাজে-খরচ আমার পছন্দনা। বাজে। খরচে সংসার নষ্ট।

বলেই মনিরউদ্দিনের মনে হল, কথাগুলো বেশি কড়া হয়ে গেছে। সে কিছুক্ষণ চুপ থেকে উদাস গলায় বলল, চিলুমচির অবশ্যি দরকার। ময়-মেহমান আসলে খাতির-যত্ন করতে হয়। না, ভালোই করছ।

শরিফা ক্ষীণ স্বলে বলল, আমার নাম লেখা আছে। চুরি হইত না।

তাও ঠিক, চিহ্ন আছে। ভালো হইছে। সিন্দুকে তুইল্যা থও। মাঝেমধ্যে তেঁতুলের পানি দিয়া মাজবা।

শরিফার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে তৎক্ষণাৎ তেঁতুলের পানি নিয়ে মাজতে বসে, এবং ঝকঝকে জিনিসটি গভীর মমতায় তুলে রাখে সিন্দুকে। যদি কোনো দিন মেহমান আসে, তা হলে এই জিনিস বেরুবে সিন্দুক থেকে।

মেহমান কেউ মনিরউদ্দিনের বাড়িতে আসে না। শুধু কিছুদিন পরপর আসে শরিফার ছোট ভাই অন্তু মিয়া। অন্তু মিয়ার বয়স এগার। অসম্ভব রোগা। সমস্ত শরীরের ভেতর বড়-বড় দুটি চোখ ছাড়া কিছুই নজরে পড়ে না। মাথা পরিষ্কার করে কামানো। সবুজ রঙের একটা লুঙ্গি এবং বেশ পরিষ্কার একটা গেঞ্জি পরে সে প্রায়ই ধুলো পায়ে সাত মাইল হেঁটে বোনের বাড়ি এসে উপস্থিত হয়। দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে উঠোনেই বসে পড়ে। আর দু পা হেঁটে ঘরে ঢোকারও যেন সামর্থ্য নেই। বড়-বড় নিঃশ্বাস নেয়। দেখে মনে হয়, এই বুঝি দম আটকে এল। শরিফা ছুটে গিয়ে এক বদনা পানি ভাইয়ের মাথায় ঢালে। অন্তুর খানিকটা আরাম হয়। শরিফা জিজ্ঞেস করে, শরীর ভালো?

অন্তু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

মাজানের শরীর?

এবারও সে মাথা নাড়ে। মুখে তার কথা নেই।

যা দু-একটা বলে, তা এতই ক্ষীণ স্বরে, শরিফা ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে না। সে কখনই খালি হাতে আসে না। কিছু-না-কিছু থাকেই তার সঙ্গে। অতি সামান্য জিনিস-এক হালি ডিম, আধ সের দুধ, একটা ছোট কাঁঠাল। এতেই শরিফার চোখে আনন্দে পানি এসে

যায়। বাপের বাড়ির জিনিস ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কতভাবে দেখে—এইটা কোন গাছের কলা রে? বিছারা তলার?

হুঁ।

নে, তুই খা।

না, তুমি খাও।

তৎক্ষণাৎ কলা ছিলে খেতে বসে শরিফা। তার বড় ভালো লাগে।

গুড়ের লাহান মিছা।

আরেকটা খাও।

না, থাউক। তোর দুলাভাইরে দিমু

অন্তু মিয়ার নিজের কিছু সম্পত্তিও এ-বাড়িতে থাকে। যেমন বুড়ো.ছাগল এবং লাল মুরগি। বুড়ো ছাগলটিকে সে এনে রেখেছে। কারণ সে টের পেয়েছে, ছাগলটিকে তার মা বিক্রি করে দেবে। চৈত্র মাসের অভাবে দরিদ্র কৃষকদের ছাগল-মুরগি সবই চলে যায়।

বোনের বাড়িতে এই ছাগলটি থাকায় অন্তু মনে খুব শান্তি পায়। বিক্রি হওয়ার ভয় নেই। এই অঞ্চলে চৈত্র মাসের অভাব এত প্রকট নয়। অন্তু মিয়া সারা দিন বোনের পেছনে-পেছনে ঘুরে রোদ পড়তেই আবার রওনা হয়ে যায়। রাতে সেকিছুতেই থাকবে না।

মনিরউদ্দিন বলে, চৈত্র মাসের এমন কড়া দিনে এত ঘন-ঘন আওন ঠিক না। অসুখে পড়ব। অন্তু মিয়ারে নিষেধ করব।

শরিফা ক্ষীণ স্বরে বলে, নিষেধ করি। ভাতের লোভে আয়। মার বাড়িত ভাত নাই। রুটি খায়।

বড় মায়া লাগে মনিরউদ্দিনের। ভাতের লোভ দুদিন পরপর ছেলেটা আসে। সে যখন অন্তু মিয়ার মতো ছিল, তখন কী ভয়ংকর অভাব। ভাতের লোভে এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি যেত।

শরিফা।

কি?

ভালো কইরা খাওয়াইবা অনুরে। থালা ভইরা গরম ভাত দিবা। গাওয়া ঘি আছে? থাকলে পাতের কিনারায় দিবা মনে কইরা। ভুল হয় না যেন।

ভাত খাওয়ার সময় মাঝে-মাঝে মনিরউদ্দিন বসে অন্তুর সামনে। ক্ষুধার্ত বালকটির খাওয়া দেখতে তার ভালো লাগে। অন্তু মনিরউদ্দিনকে বড় ভয় পায়। সহজভাবে তার সামনে খেতে পারে না। শরিফা বলে, আপনের সামনে অন্তুর খাইতে শরম লাগে।

শরম? শরমের কী আছে? খাওনের মইধ্যে শরম কিছু নাই। লও, আর চাইরডা ভাত লও। তেঁতুল দিয়া মাইখ্যা খাও।

অন্তু মিয়া হাঁসের মতো গলা টেনে-টেনে ভাত খায়। মনিরউদ্দিন দরাজ গলায় বলে বসে, এইবার ঈদে তোমারে টুপি আর পাঞ্জাবি দিম। কচুয়া পাঞ্জাবি আর সাদা টুপি। না তুমি সাদা পাঞ্জাবি চাও?

অন্তু মুখভর্তি ভাত নিয়ে কোনোমতে বলে, কচুয়া।

আইচ্ছা ঠিক আছে, কচুয়া।

অন্তু মিয়া তার কচুয়া পাঞ্জাবির কথা ভোলে না। যত বারই আসে, শরিফার কাছে খোঁজ নিয়ে যায় দুলাভাইয়ের পাঞ্জাবির কথাটা মনে আছে কি না। মনে না-থাকলে যেন মনে করিয়ে দেওয়া হয়।

শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবিটা কেনা হয় না। শরিফার জন্যে একটা মোটাপাড় শাড়ি, সংসারের দুই-একটা টুকিটাকি কিনে, টাকার টান পড়ে যায়। বড় ঈদে কিনে দেওয়া যাবে এই ভেবে বাড়ি ফেরেমনিরউদ্দিন। অন্তুর জন্যে বড় মায়া লাগে। সে দুপুরের কড়া রোদে হেঁটে এসেছে পাঞ্জাবির জন্যে। ছেলেমানুষ সে, সংসারের টানাটানি এখনো বোধহয় সেরকম বোঝ না।

বড় ঈদে কিন্যা দিমু, বুঝলা অন্তু।

জি আইচ্ছা।

মনিরউদ্দিন গম্ভীর গলায় বলল, বড় ঈদে না কিন্যা দিলে আমি বাপের পুত না। বড় ঈদ তুমি আমরার সাথে করবা।

জ্বি আইচ্ছ্যা।

এক দিন আগে চইলা আইবা। একত্রে জামাতে যামু।

জ্বি আইচ্ছা।

বড় ঈদে অন্তু এক দিন আগে ঠিকই আসে। পাঞ্জাবি পায় না। সেসময় মনিরউদ্দিনের বড় দুঃসময়। একটা পয়সা হাতে নেই।

খুব শরমিন্দা হইলাম তোমার কাছে অন্তু মিয়া। গরিব হওন বড় শরমের ব্যাপার।

জামাতের সময়টায় মনিরউদ্দিন মুখ অন্ধকার করে কাঁঠালগাছের নিচে বসে থাকে। নামাজে যেতে ইচ্ছা করে না। শরিফাকে এসে বলে, নামাজে যামু না ঠিক করলাম।

শরিফা চোখ কপালে তুলে বলে, কী সর্বনাশের কথা কন!

ঈদের নামাজ গরিবের জন্যে না।

আল্লাহ-নারাজ কথা কইয়েন না। অন্তরে লইয়া নামাজে যান। আর আপনে মনটা অত খারাপ করছেন ক্যান? ঈদ তো শেষ হয় নাই। আরো তো ঈদ সামনে আছে।

কুপি জ্বলছে। তার লাল শিখার সামনে শরিফা বসে আছে নতমুখে। তার নাকের সবুজ ফল অসম্ভব সুলস্থুল করছে। নাকফুলটার দিকে তাকিয়ে আছে মনিরউদ্দিন। দরজার কাছে অন্তু মিয়ার বুড়ো ছাগল। সে মাথাটা ঢুকিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দিল যে সে, এসেছে, তবে এই মুহূর্তে ঘরে ঢোকার ইচ্ছা নেই। লাল মুরগিটিও ঘরের ভেতর এক পা দিয়ে আবার বাইরে চলে গেল। অন্য মুরগিটাও তাই করল। এরা শরিফার ডাকের অপেক্ষা করে। না-ডাকা পর্যন্ত ঘরে ঢুকবে না, বারবার উঁকি দিয়ে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেবে।

মনিরউদ্দিন মৃদু সুরে ডাকল, শরিফা।

কি?

সিন্দুকের মইধ্যে দুই শ টাকা আছে। তুই জানস?

জানি।

যদি আমার কিছু হয়, ঐ টেকাডি দিয়া পইলা একটা কাম করিস।

শরিফা ঠাণ্ডা গলায় বলল, কি কাম?

অন্তু মিয়ারে একটা পাঞ্জাবি, পায়জামা আর টুপি কিইন্যা দিবি।

শরিফা কিছুই বলল না। দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। মনিরউদ্দিন নরম গলায় ডাকল, শরিফা।

কি?

কান্দস ক্যান? কাইলা কিছু হয় না। কান্দিস না। আমার মনে হয় না আমার কিছুহইব। অতক্ষণ যখন টিইক্যা আছি। কিছু হওয়ার হইলে এর মইধ্যে হইত। অখন শইডা ভালোই লাগছে।

পাওডাত ব্যথা নাই?

আছে। ব্যথা আছে। সাপের বিষ সহজ জিনিস তোনা। কঠিন জিনিস। একটা বিড়ি দে। তোষকের নিচে আছে।

শরিফা বিড়ি এনে দিল। মনিরউদ্দিন লক্ষ করল শরিফার ব্লাউজের একটি বোতাম এখন খোলা, অথচ মোটেও লক্ষ নেই এদিকে। সকালে একবার বলেছিল, তারপরও হুঁশ হয় নি। একবার ভাবল এই নিয়ে কিছু বলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলল না। হঠাৎ করে পায়ে অসম্ভব ব্যথা হচ্ছে। এ-ব্যথা আগের মতো না। অন্য রকম ব্যথা। মনিরউদ্দিন বিড়ি ফেলে দিয়ে চেচিয়ে কেঁদে উঠল। সমস্ত দিনের মধ্যে এই প্রথম সে কাঁদল। অন্তু মিয়ার বুড়ো ছাগল ঘরে ঢুকে তাকিয়ে আছে মনিরউদ্দিনের দিকে।

শরিফা।

কি?

আমার মামি যদি কোনোদিন ফিইরা আসে, যত্ন করিস। জলচৌকির উপরে বসাইয়া পাও ধুইয়া দিস। নিজের হাতে পাও ধুয়াইবি। মামির জইন্যে মন কান্দে।

আপনের শইল কি বেশি খারাপ?

মনিরউদ্দিন জবাব দিল না। শরিফা যেখানে বসে ছিল, সেখানেই বসে রইল। তার গালে জলের সূক্ষ্ম দাগ। সে তাকিয়ে আছে কুপির দিকে। কেমন লালচে দেখাচ্ছে তার মুখ।

শরিফা।

কি?

অন্তু মিয়ার কথা যেটা কইলাম মনে রাখিস। ভুল হয় না যেন। টাকা বড় জিনিস না। মায়া-মহতটা বড় জিনিস। পাঞ্জাবিটা ভাল জমিনের কিনবি।

শরিফার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। মনিরউদ্দিন ধরা গলায় বলল, আর শোন্ শরিফা, আমার উপরে কোনো রাগ রাখিস না।

এইডা কী কন?

মনিরউদ্দিন বিড়িতে লম্বা একটা টান দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাশল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, সে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। হাত থেকে জ্বলন্ত বিড়ি পড়ে গেছে। কিন্তু না, সে ঘুমুচ্ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই নড়েচড়ে উঠল। অস্পষ্ট গলায় ডাকল, শরিফা, ও শরিফা।

কি?

খবির হোসেন লোকটারে মান্য করবি। ভালো লোক।

আফনে চুপ কইরা থাকেন। এট্টু বাতাস করি?

মনিরউদ্দিন হ্যাঁ-না কিছুই বলল না।

১২. মাগরেবের নামাজের আজান

খবির হোসেন মাগরেবের নামাজের আজান দিলেন এবং বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলেন, বেশ কিছু লোকজন আসছে। তাঁর মন আনন্দে পূর্ণ হল। একটি লাইন পুরো হলেও মনে শান্তি। এক জনের কথা আল্লাহ্ না-শুনতে পারেন, কিন্তু দশ জন মানুষ একত্রে দাঁড়ালে অন্য রকম জোর হয়। নামাজ পড়িয়েও আনন্দ।

অজুর পানি তোতা নেই, এটা একটা সমস্য হতে পারে। সবাই এসে অজু করতে চাইবে, এবং বিরক্ত হবে। পরে অন্য এক দিন যখন নামাজে যেতে ইচ্ছা করবে তখন যাবে না এই অজুহাতে যে, অজুর পানি নেই। মানুষের অজুহাতের শেষ নেই। এরা অন্ধকার থেকেও অজুহাত খুঁজে বের করে।

খবির হোসেন আজান শেষ করে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। না, লোকগুলি তাঁর এখানে আসছে না। উত্তরের রাস্তা ধরে এগুচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? মনিরউদ্দিনের বাড়ির দিকে কি? মনিরউদ্দিনের কিছু হয়েছে নাকি?

শক্ত বাতাস দিচ্ছে। মেঘ উড়ে-উড়ে যাচ্ছে বাতাসে। এখন পর্যন্ত বৃষ্টির একটি ফোঁটা পড়ে নি। এরকম কিছুক্ষণ চললে হয়তো আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঝকঝকে তারা উঠবে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলেই তাঁর বান্দার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। বান্দারা অন্ধ বলে সেটা টের পায় না। ফাবিয়ায়ে আলা রাব্বিকুমা তুকাজজিবান। আল্লাহপাকের নিয়ামত অস্বীকার করার কোন পথ নেই। এই অনন্ত আকাশ, শস্যের বিশাল মাঠ, জলভরা নদীসবই তাঁর দান।

নামাজে দাঁড়িয়ে খবির হোসেনের মনে হল, তিনি কান্নার শব্দ শুনছেন। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই মনের ভুল। মনিরউদ্দিনের বাড়ি অনেকটা দূরে। এতদূর থেকে কান্নার শব্দ আসার কথা নয়। এটা অন্য কোনো শব্দ। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে, সেই আনন্দে হয়তো দল বেঁধে সবাই বের হয়েছে। আবার খবির হোসেনের নামাজের গণ্ডগোল হল। রুকুতে না-গিয়ে সেজদায় চলে গেলেন। শয়তান চলাফেরা করে রক্তো সে-ই এইসব করাচ্ছে। তুচ্ছ জাগতিক বিষয়ে তাঁর মন ফিরিয়ে আনছে। হে আল্লাহপাক, হে করুণাময়, তুমি শয়তানের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।

কিন্তু কান্নার শব্দটি সত্যি-সত্যি আসছে। এর মানে কী? কে কাঁদবে?

১৩. কাঁদছিল অন্তু মিয়া

কাঁদছিল অন্তু মিয়া।

সে খবর পেয়েই রওনা হয়েছে। তার শরীরটা ভালো না। মসজিদের কাছাকাছি। এসে আর চলতে পারছে না। রাস্তার পাশে বসে শব্দ করে কাঁদছে। এবারও সে খালিহাতে আসে নি। তার লুঙ্গির খুঁটে কাঁচা সুপারি। বোনের জন্যে নিয়ে এসেছে। এরকম ভয়াবহ দুঃসংবাদ পাওয়ার পরেও সুপারিগুলি সে জোগাড় করেছে। শিশুরা পৃথিবীর কোনো দুঃসংবাদই স্বীকার করে না।

খবির হোসেন বললেন, তুমি কে?

কোনো জবাব এল না।

তুমি কি এই গেরামের?

না।

নাম কি তোমার?

অন্তু মিয়া।

ও আইচ্ছা, চিনলাম। পথের মইধ্যে বইসা কানতে ক্যান? ধর, আমার হাত ধর। চল আমার সঙ্গে। আমারে চিনছ?

অন্তু খবির হোসেনের হাত ধরল। রোগা একটা হাত। কিছুক্ষণ পরপর কেঁপে। কেঁপে উঠছে। খবির হোসেন গভীর মমতায় বললেন, ও বাঁইচ্যা আছে। কিছু হয় নাই। কিছু হইলে খবর পাইতাম। মরণের খবর পাইতাম। মরণের খবর গ্রামের ইমাম পায় সবার আগে। বুঝলা? ধর, শক্ত কইরা আমার হাত ধর। তামার খুঁটের মইধ্যে কি?

সুপারি।

বোনের জইন্যে আনছ?

অন্তু মিয়া মাথা নাড়ল এবং অন্য হাতের তালুতে চোখ মুছল।

মনিরউদ্দিনের বাড়ির সামনে একটি গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জলিল নিয়ে এসেছে। মনিরউদ্দিনকে গঞ্জে নিয়ে যাওয়া হবে। অনেক লোকজনকে দেখা যাচ্ছে। বেশ বড় একটা জটলা। গ্রামের মাতবর শ্রেণীর লোকজনও সবাই আছে। বজলু সরকার ভারি গলায় নির্দেশ দিচ্ছেন। উঠোনে তিন-চারটা হারিকেন এবং কুপি। তাতেও ঠিক আলো হচ্ছে না।

বজলু সরকার বললেন, সঙ্গে কে কে যাইতেছে? শুধু জলিল গেলে কাম হইত না। আরেকজন দরকার।

খবির হোসেন এগিয়ে গেলেন। তিনি যাবেন। সঙ্গে তাঁর বেতের সুটকেসটা থাকবে। পিছুটান রাখতে চান না। হয়তো গঞ্জ থেকে আবার ফিরে আসবেন, হয়তো ফিরে আসবেন না।

১৪. গরুর গাড়ি হেলেদুলে চলছে

গরুর গাড়ি হেলেদুলে চলছে। নিচে বেঁধে-দেওয়া লণ্ঠন থেকে আলো এসে চারদিক যেন আরো অন্ধকার করে দিচ্ছে। একটা কাঁথায় সমস্ত শরীর ঢেকে শুয়ে আছে মনিরউদ্দিন। সে বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছে। মাঝেমাঝে তাকে ডেকে কথা বলছেন খবির হোসেন। সাপে-কাটা রুগীকে কিছুতেই ঘুমুতে দেওয়া যাবে না। জাগিয়ে রাখতে হবে।

ও মনির। মনির। মনিরউদ্দিন।

জ্বি।

ঘুমাইও না। কথা কও। মনির। ও মনিরউদ্দিন।

জ্বি।

ঘুমাইও না। এট্টু উইঠা বস।

মনিরউদ্দিন উঠেবসে না। ঝিম ধরে থাকে। ভোরবেলার স্বপ্নটা আবার যেন দেখতে পায়। ভোরবেলার স্বপ্নে একটি নারীর কোমল মুখ ছিল। দুটি জলভরা স্নিগ্ধ চোখ ছিল। সেই নারীকে সে চেনে, আবার চেনেও না। কে সেঃ মনিরউদ্দিনের বড় জানতে ইচ্ছা করে।

খবির হোসেন গাড়ির পেছনে পা ঝুলিয়ে বসেছেন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন অন্তু মিয়া আসছে গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে। সে ঘন-ঘন হাতের তালু দিয়ে চোখ মুছছে। খবির হোসেন একবার

ভাবলেন, ছেলেটাকে বাড়ি চলে যেতে বলবেন। কিন্তু বললেন না। আসুক। এক সময় গ্রামের শেষ সীমায় এসে নিজেই থেমে যাবে। মানুষকে কোথাও-না-কোথাও থামতে হয়।

বেশ শক্ত বাতাস দিচ্ছে। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া। হয়তো বৃষ্টি হচ্ছে কোথাও। খবির হোসেন তাকিয়ে আছেন অন্তুর দিকে। অন্তু ছোট-ছোট পা ফেলে এগুচ্ছে, যেন কেউ তাকে থামাতে পারবে না।